
হলুদ
বসন্ত
বুদ্ধদেব গুহ

হলুদ বসন্ত

বুদ্ধদেব গুহ



আ ন ন্দ

"সুখ নেইকো মনে
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে
হলুদ বনে বনে।"

যদিও তুমি আমাকে অনুক্ষণ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ, আমি তোমাকে অমৃত করে দিলাম। আমার মনের হিজলের শাখা থেকে মুক্ত করে আমার একান্ত পাখিকে আমি চিরকালের, আকাশের করে দিলাম।

১

ফোনটা বাজছিল।

অন্য প্রান্তে ফোনটা কুরর্— কুর্ কুরর্— কুর্ করে কোনও মেঘলা দুপুরের কামাতুরা কবুতরের কথার মতো বাজছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। টেলিফোনটা ওদের বাড়ির সিঁড়িব কাছে আছে। এখন বাড়িতে কে কে থাকতে পারে? সুজয় নিশ্চয়ই আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। ক'দিন বাদে দোল। পাড়ায় দোল-পূর্ণিমার ফাংশন হবে। তাই নিয়ে পাড়ার রুস্তমরা ব্যস্ত। ফাংশন না কচু। ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে রেলিশ করে কিছু মেয়ে দেখা। রুস্তমদের রং ফিকে হয় না। বুকের লোম পেকে গেলেও না। বেশ আছে ওরা। টেরিলিন-টেরিকটে মোড়া বৃদ্ধ বালখিল্যের দল। নয়নার মা নিশ্চয়ই ঠাকুরঘরে চুপ করে বসে আছেন। এমন ভাব, যেন পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনা সব ওই ঠাকুরঘরের কন্ট্রোলরুম থেকেই রেডিয়ো কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ফোনটা বাজছেই— বাজছেই— বাজছেই।

নয়না এখন কী করছে? বোধহয় ঘুমুচ্ছে। সারাদিন পরিশ্রম তো কম নয়। নয়নার কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ওর সমবয়সি মেয়েদের পটভূমিতে ও বর্ষার জল-পাওয়া মৌরলা মাছের মতো লাফায়, অথচ ও আমার কাছে এলে শীতের সংকোশ নদীর ঘরেয়া মাছের মতো ধীরা হয়ে থাকে। আস্তে মাথা দোলায়, আলতো করে চোখ তুলে চায়, মুখে যত না বলে, চোখ দিয়ে তার চেয়ে বেশি কথা বলে। ওকে বুঝতে পারি না— ওকে একটুও বুঝতে পারি না। অথচ ওকে কী করে বোঝাই যে ওর এক চিলতে হাসি, ওর এক ঝিলিক চোখ চাওয়া— এইসব সামান্য সামান্য দান আমার সমস্ত সকাল, আমার সমস্ত দিন কী অসামান্য মহিমায় মহিমামণ্ডিত করে তোলে। গত পাঁচ বছর ধরে কখনও এ কথাটা ওকে বোঝাতে পারিনি— কিংবা ও বুঝলেও, না বোঝার ভান করে থেকেছে।

'হ্যালো।'— ওপার থেকে নয়নার মা'র গলা শোনা গেল। গম্ভীর, ঠান্ডা, নিরুৎসাহব্যঞ্জক গলা। অথচ ভদ্রমহিলা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বন্ধুর মা তো বটেই। আমি ফোন করলেই শুধোন, ওঁদের বাড়ি কেন যাই না— কাকিমার আর্থারাইটিস কেমন আছে—? মিনুর বাচ্চাটা (২ নং) ভাল আছে কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ তবু, আমার ইচ্ছে করে না ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। বোধহয় মনে পাপ আছে বলে। আচ্ছা, ভালবাসা কি পাপ? জানি না। বোধহয় অন্যায়ভাবে, জোর করে

ভালবাসাটা পাপ। নইলে এমন ভীরুতা, চোর চোর ভাব, অন্যায় বোধ আসে কেন?

আবার শুনলাম, 'হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!'

কোনও উত্তর দিলাম না। কেন দেব? আমি তো ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইনি! অফিস থেকে ফিরে, পায়জামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে আরাম করে সোফাটায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পাখাটাকে আস্তে খুলে দিয়ে আমি নয়নার সঙ্গে কথা বলব বলেই ফোন ডায়াল করেছিলাম। আমি তো অন্য কাউকে চাইনি। আমি তো অন্য কাউকে চাই না।

ভাবলাম, রিসিভার নামিয়ে রেখে দিই। কিন্তু হঠাৎ দেহাভ্যন্তরীণ কোনও যান্ত্রিক গোলযোগে অনিচ্ছায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, হ্যালো। আমি ঋজু।

কী ব্যাপার?

লজ্জায় মরে গেলাম। ইস। তবে কি ওঁর কাছেও ধরা পড়ে গেলাম? বললাম, কোনও ব্যাপার নেই। মানে, নয়না আছে? গতকাল আপনাদের ওখানে গিয়েছিলাম— বসবার ঘরে আমার দেরাজের চাবিটা বোধহয় ফেলে এসেছি। পাচ্ছি না।

মাসিমা আবার শুধোলেন, তোমার গাড়ির চাবি ফেলে গেছ?

আমি বললাম, না। দেরাজের চাবি। (গাড়ির চাবি ফেলে এলে আর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এলাম কী করে? যাচ্ছেতাই। কানে আজকাল কম শুনছেন।)

কোথায় ফেলেছ মনে আছে বাবা?

আমি বললাম, নয়নাকে একবার জিজ্ঞেস করুন না? কাল ও কাছে ছিল, গল্প করছিল।

দাঁড়াও। ফোনটা ধরো একটু।

শুনতে পেলাম, সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে মাসিমা নয়নাকে ডাকলেন। গমগম করে উঠল। যেমন গমগমে গলায় আমার মাথার মধ্যে নয়নার নাম শুনি আমি—কোনও অসহ্য একলা গরম দুপুরে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম। রিসিভারের জালে ডাবল হর্নটা ঝমঝমিয়ে বেজে উঠল। একটু পরে নয়না এসে ফোন ধরল।

কী হল? হলটা কী?

আমার চাবি।

আপনার চাবি?

হ্যাঁ! আমার চাবিটা, দেরাজের চাবিটা: তোমাদের বাড়ি কাল ফেলে এসেছি।

পাচ্ছেন না?

না।

জ্বালালেন। দাঁড়ান দেখি।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, সব তো দেখলাম, সোফার কোনা, মেঝে;

এমনকী রাস্তায় যেখানে আপনার গাড়ি ছিল সেখানে অবধি। যদি গাড়িতে উঠবার সময় পড়ে গিয়ে থাকে, তাই ভেবে। কিন্তু নেই। পেলাম না।

নেই?

না। বললাম তো পেলাম না।

পাবে না।

মানে?

মানে আমার চাবি আমার সামনেই আছে। হারায়নি। বলেই টুং টুং করে চাবিটা রিসিভারের সঙ্গে বাজালাম।

ইস। কী খারাপ আপনি— ভারী অসভ্য। কেন অমন করলেন?

তোমার মা কেন ফোন ধরলেন?

মা কি যম?

আমার যম। আমার ভীষণ ভয় করে তোমার মাকে।

আমার মা'র মতো লোকই হয় না।

তারপর একটু খুশি খুশি গলায় বলল, তারপর? আপনার কী খবর বলুন?

আমি বললাম, আমার আবার কী খবর? তোমার সঙ্গে একলা কথা বলতে একলা দেখা করতে ইচ্ছে করে। ভাল লাগে। তাই অফিস থেকে ফিরে তোমাকে ফোন করলাম। তুমি বিরক্ত হলে?

না, আপনার ফোন এলে আমার ভাল লাগে।

আমার চিঠি পেয়েছ? পরশু পোস্ট করেছিলাম।

হুঁ।

কেমন লাগল?

ভাল।

শুধু ভাল?

ভীষণ ভাল।

একটারও জবাব দাও না কেন?

মানে, সময় হয়ে ওঠে না, তা ছাড়া আপনার মতো ভাল চিঠি লিখতে পারি না। 'কেমন আছেন? ভাল আছি। কলেজের প্রিন্সিপাল আজ এই বললেন' এই রকম চিঠি লেখার তো কোনও মানে হয় না। যেদিন আপনার মতো করে লিখতে পারব, সেদিন লিখব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

কী হল? কিছু বলুন।

তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন?

বাসি না?

না।

খুব বাসি। (বলে একটা নিশ্বাস ফেলল।)

আমি অনুক্ষণ, অনুক্ষণ তোমার কথা ভাবি, তোমার কথা ভাবি, আর তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না।

তারপর আবার চুপ। কোনও কথা নেই। হঠাৎ নয়না বলল, ভালবাসলে কী করতে হয়?

কী জবাব দেব জানি না। ইচ্ছে হল বলি, চুমু খেতে হয়, আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়— অনিমেষ আশ্লেষে অন্যের মধ্যে আপ্লুত হতে হয়। কিন্তু ওসব কথা বলা যায় না। একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। ঝড় একবার উঠলে নদীতে কত বড় বড় ঢেউ উঠবে তা আমি জানি না— সে ঢেউয়ে হাল ধরতে পারব কি না তাও জানি না। তবু খুব ইচ্ছে করল, বলি— যে-কথা সব সময় বলতে চাই— ঘুমুবার সময় বলতে চাই, ঘুম ভেঙে বলতে চাই— কাজের ফাঁকে ফাঁকে বলতে চাই— সেই কথা বলবার জন্যে আমায় আমন্ত্রণ জানাল নয়না; অথচ আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ভালবাসলে কী করতে হয় এই সরল সোজা প্রশ্নের উত্তরে বললাম, জানি না।

নয়না সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও জানি না।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

আমি বললাম, তুমি কী শাড়ি পরে আছ?

বাজে; বাড়ির শাড়ি।

তবু, বলো না!

হলুদের মধ্যে কালো কাজের একটি কটকি শাড়ি।

আর জামা?

উঃ, জ্বালালেন আপনি। হলুদ জামা।

দাঁড়াও, মনে মনে আমার চোখের আয়নায় দাঁড় করিয়ে তোমায় দেখে নিই। বাঃ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো। হুবহু একটি হলুদবসন্ত পাখি।

নামটা পছন্দ, কিন্তু আমি তো সুন্দর না।

তুমি সুন্দর না?

সবাই বলে।

সবাইর তো চোখ নেই। তোমার সৌন্দর্য সকলের জন্যে নয়।

থাক, বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না। বাজে কথা রাখুন। টেনিস খেলতে গিয়ে পায়ে যে চোট লেগেছিল, এখন কেমন আছে?

কাল থেকে ভাল।

তবু, পুরোপুরি সারেনি তো?

না। এখনও একটু ব্যথা আছে।

কয়েকদিন না খেললে কী হয়? খেলোয়াড় যা, সে তো আমি জানি। যান তো অনেক সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে দেখতে। তাই না?

সব মেয়েকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে ঘোড়ফরাস দেখতে আমি

বেশি ভালবাস।

উপমাটাও ভদ্রজনোচিত দিতে পারেন না? আপনি সত্যিই একটি জংলি হয়ে যাচ্ছেন।

আমি তো জংলিই।

বাঃ। খুব বাহাদুরির কথা, না?

বাহাদুরি নয়। আমি যা, আমি তাই। তোমাদের সংজ্ঞায় সভ্য হতে চাই, সবসময় চেষ্টা করি; পারি না, সত্যি সত্যি পারি না।

চেষ্টা করুন, চেষ্টা করতে থাকুন। কঠিন কাজ কি কেউ একবারে পারে? ওঃ শুনুন মনে পড়েছে। আপনার সেই লেখাটা আমার বান্ধবী সুমিতার খুব ভাল লেগেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে।

জানোই তো আমি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি না। কিন্তু লেখাটা তোমার কেমন লেগেছে বলোনি তো একবারও?

আমার? আমার মত দিয়ে কী হবে?

তুমি জানো না কী হবে?

না। জানি না।

তুমি নিজে একটি জংলি। পৃথিবীসুদ্ধ লোক হাই-ফাই অ্যামপ্লিফায়ারে চিৎকার করে আমাকে ভাল বললেও আমার যতটুকু না আনন্দ হবে, তুমি একা যদি আমায় ভাল বলো— আন্তরিকভাবে— তাতে আমার অনেক বেশি আনন্দ হবে।

তাই হবে বুঝি?

জানো নয়না, ছোটবেলা থেকে জনারণ্যের মুখ চেয়ে বড় হইনি— আজও মাত্র একজন দু'জনের দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছি— যা কিছু করার করছি— তাই তাদের মধ্যে কেউ যদি ফাঁকি দেয়, তখন অন্ধের মতো দিশেহারা হয়ে পড়ি— পথ দেখতে পাই না। কী করব বুঝতে পারি না। বুঝলে?

বুঝলাম, কিন্তু আমি কোনও অন্ধের যষ্টি হতে রাজি নই।

তা আমার মতো করে আর কে জানে?

কিছুক্ষণ চুপ।

কী করছিলে? ঘুমুচ্ছিলে?

না স্যার। আপনার মতো সবসময় ঘুমুই না। সোমবার পরীক্ষা। পড়ছিলাম।

কী পরীক্ষা?

উইকলি পরীক্ষা।

তা হলে তো এতক্ষণ কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করলাম।

না। এতটুকুতে আর কী ক্ষতি হবে?

বললাম, তবু যাও পড়ো গিয়ে লক্ষ্মী, সোনা মেয়ে।

নয়না বলল, আচ্ছা। ও এমনভাবে ফোন ছাড়ার আগে আচ্ছা বলে, মনে হয় সুন্দর সুগন্ধি কোনও ভালবাসার চিঠিতে সিলমোহর দিল। চুমু খাওয়ার মতো মিষ্টি করে

বলল, আ—চ্ছা!

তুমি ছাড়ো ফোন।

না। আপনি আগে ছাড়ুন।

ফোন ছেড়ে দিলাম।

এই মুহূর্তে আমার এত ভাল লাগছে যে কী বলব! আমার কী যে ভাল লাগে; কী যে ভাল লাগে। নয়নার সঙ্গে এই যে একটু কথা বললাম, এর দাম জানি না। কেন এমন হয় তাও জানি না। কীই বা জানি? কতটুকু বা জানি? শুধু জানি যে শোবার সময় যখন ফুরফুর করে বসন্তের বাতাস মাধবীলতাটায় দোল দিয়ে আমার নেটের মশারিতে ঢেউ তুলে উত্তরের জানালা দিয়ে পথে বেরোবে— তখন আমি রাজার মতো, মহারাজের মতো, বিড়লার সমান বড়লোকের মতো আরামে, আবেশে, নয়নার উজ্জ্বল চোখ দুটি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব। সেই আনন্দের বদলে আমি আর কিছুই চাই না। কিছুতেই তো বিনিময় করতে পারি না।

২

এই একটা দিন। রবিবার। সারা সপ্তাহ এর মুখ চেয়ে থাকা। সপ্তাহে ছ'দিন সকাল আটটা থেকে রাত সাতটা করি। ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে গা জ্বালা করে। কিন্তু ওই যে পুরুষালি জেদ। ক'জন লোক আর শুধু পয়সার জন্যে খাটে? খাটে লোকে জেদের জন্যে। আমি পারি, ভাল করে পারি, এইটে প্রমাণ করার জন্যে। বিজিতেনবাবু একদিন বলেছিলেন; তখন আমি ছেলেমানুষ; সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কারখানায় ঢুকেছি। বলেছিলেন, প্রফেশনাল ফার্মে গুডউইল নিজের নিজের তৈরি করে নিতে হয়— বাপ-কাকার নামে চলে না। মামা বড় ইঞ্জিনিয়ার বলে লোকে আপসে ভাগনেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার বলবে না। মানে, কটাক্ষ করে এমনভাবে কথাটা বলেছিলেন যে, মনে লেগেছিল। ভেবেছিলাম মামা বেচে খাব এই বা কেমন কথা? যে নিজের পরিচয়ে পরিচিত নয়, নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়, সে আবার পুরুষ কীসের? ব্যস। ওই জেদেই গেল। মাথার চুল পাতলা হল, চোখের কোনায় কালি জমল, চেয়ারে বসে বসে তলপেটে চর্বির আস্তরণ পড়তে লাগল। বিনিময়ে, বুকের কোনায় হয়তো কিছু আত্মবিশ্বাস জন্মাল।

সত্যি বলতে কী, এরকম সাফল্যে আত্মপ্রসাদ হয়তো আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। বর্তমানটাকে পদদলিত করে নিজেকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলাম বটে— কিন্তু কখনও কখনও— কাজের ফাঁকে ফাঁকে— টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে— কোনও কালোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দূর দিগন্তে মনে মনে ছুটির ছবি দেখি— কানে নিচু-গ্রামে ছুটির বাজনা বাজতে শুনি, তখনই মনটা কেঁদে ওঠে। ইচ্ছে করে গ্যাডগিল এন্ড ঘোষ কোম্পানির মুখে লাথি মেরে, কাচের জানালা

ভেঙে কোনও পাখি হয়ে উড়ে চলে যাই। কোনও সমুদ্র কিনারে। অনেকদিন আগে-যাওয়া গোপালপুরে। যেখানে আসন্ন সন্ধ্যার করুণ সুগন্ধি ম্লানিমায়, সুনীল আকাশের পটভূমিতে শ্বেতা ফেনার বুদবুদ মেখে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই নিজে উড়ে বেড়াই। যেখানে আমার কোনও কর্তব্য নেই, আমার উপর কারও দাবি নেই। ইচ্ছে করে, নিজের মনের ইজেল বালুবেলায় সাজিয়ে অবসরের প্যাস্টেল কালারে, খুশির তুলিতে ছবির পর ছবি আঁকি।

রবিবারের Gun-club-এ একটা মেলা মেলা আবহাওয়া আছে। সারি দিয়ে সকলে বন্দুক দেখে নিচ্ছে। প্রথমে স্কিট-শুটিং, পরে ট্র্যাপ-শুটিং হবে। শুটিং-পজিশনে দাঁড়িয়ে উড়ন্ত ডিশকে গুঁড়িয়ে দেবার একটা আনন্দ আছে। মনে মনে অবচেতনে আমি যা পছন্দ করি না, আমি যা ঘেন্না করি, আমি যা সইতে পারি না— সেই সবকিছুকে আকাশ থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোর সঙ্গে পড়তে দেখি। ভারী আনন্দ লাগে।

সুগত হাই-হাউসের নীচে দাঁড়িয়ে ওর পাখিকে ডাকল। শট-গানটা ডান থাইয়ের উপরে বসিয়ে শক্ত করে ধরে ডাকল— পুল। অমনি হাই-হাউস থেকে মাটির ডিস্ক বেরিয়ে গেল মেশিনে— সাঁই করে। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে— মুহূর্তের মধ্যে দূরে চলে যাচ্ছে—দুম্। আকাশে গুঁড়ো হয়ে গেল। নীল আকাশের পটভূমিতে একমুঠো কালো ধুলোর মেঘ ফুটে উঠে বৃষ্টি হয়ে নীচে পড়ল।

এবার লো-হাউসের পাখি আসবে। সুগত রেডি হয়ে বলল, পুল— নিচু দিয়ে এবার সামনে থেকে উড়ে এল, কাদার ডিস্ক— এল এল; এল— একেবারে সামনে— দুম্। আবার গুঁড়িয়ে গেল।

এবার ডাবল। একসঙ্গে হাই এবং লো— দু'দিক থেকে দুটি পাখি উড়ে এল— দূরে-যাওয়া পাখিকে আগে মেরে, কাছে-আসা পাখিকে পরে মারতে হবে, তাই নিয়ম। দুম্ দুম্— আবার দুটি। পাখিরা গুঁড়ো হয়ে পড়ল।

বন্দুকের ইজেক্টরটা মাঝে মাঝে জ্যাম হয়ে যাচ্ছিল— ব্রিচটা খুলে দেখছি— এমন সময় যতি এসে ফিসফিস করে কানের কাছে বলল, ঋজুদা গাড়িটা দেখেছ? প্যাভিলিয়নের পাশে চেয়ে দেখো।

চেয়ে দেখলাম— একখানা গাড়ির মতো গাড়ি বটে— একটা চাঁপা রঙা জাগুয়ার স্পোর্টসকার প্যাভিলিয়নের পাশে দাঁড় করানো। ভাল করে দেখার আগেই সুগত ডাকল, এই ঋজু, কী হল? এসো।

আমি বললাম, আমার বন্দুকের ইজেক্টর খারাপ হয়ে গেছে।

ও ধমকে বলল, ঝামেলা কোরো না— এসো।

সুগতর অভিযোগ আছে যে কোনওদিনই আমি সিরিয়াসলি অনুশীলন করলাম না। কেন জানি না— প্রতিযোগিতায় আমি নামতে চাই না কারও সঙ্গে—কোনও ব্যাপারেই। যে প্রতিযোগিতা পেটের জন্যে করতে হয়— তার কথা স্বতন্ত্র। সে প্রতিযোগিতায় না নেমে উপায় নেই। কিন্তু তা ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতায় নামার শখ

আমার নেই। এক প্রতিযোগিতাতেই আমি হাঁপিয়ে গেছি; ফুরিয়ে গেছি। বরং জীবনের অনেকানেক ক্ষেত্রে অনবধানে ঢুকে পড়ে রংরুটের মতো যেটুকু মজা লুটে নিতে পারি, সেটাই দৈনন্দিন প্রতিযোগিতার গ্লানি ঢেকে রাখার জন্যে প্রয়োজন আমার। আমি পারি না। প্রতিযোগিতাতে হেরে যাবার জন্যেই আমি জন্মেছিলাম।

তবু সুগত আমায় ভালবাসে; তাই বলে। ক'জনই বা ভালবাসে? এত বড় পৃথিবীতে ক'জনই বা কাকে কাছ থেকে চেনে, জানে, বোঝে? সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সুগত অন্যতম; আমার জঙ্গলের বন্ধু।

কোনওরকমে একটা 'ডিটেল' ছুড়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম গাড়িটার পাশে। যতি আগেই গেছে। রঞ্জনও গুটি গুটি এল। গাড়ি একখানা।

এয়ার কন্ডিশনড তো বটেই— যেমন চেহারা তেমন গড়ন। টায়ারগুলো ইয়া মোটা, মোটা এক জোড়া সাইলেন্সার চকচক করছে— দরজাটা খুলে যেখানে খুশি ছেড়ে দিলে সেখানেই আটকে থাকে। ধরে থাকতে হয় না। রঞ্জন গাড়িটার গায়ে ঠোঁট লাগিয়ে চুঃ শব্দ করে একটা চুমু খেল। যতির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। গাড়িটার পেছনের কাচের এক কোণে এমব্যস করে নাম লেখা রয়েছে "লাভ ইন দ্য আফটারনুন"।

গাড়ির মালিককে আমরা চিনি। বেঁটেখাটো গর্বিত চেহারা। পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। মিস্টার সিধু। অনেক ব্যাবসা-ট্যাবসা আছে। যতি ডাকত, বিধুমুখী। ভদ্রলোকের এরকম আরও গোটা পাঁচ-সাত গাড়ি আছে। এক একদিন এক একটা নিয়ে আসেন। আমরা আমাদের ঝরঝরে অ্যামবাসাডারে, এবং যতি, যতির আড়াই-পাক-ফলস্-স্টিয়ারিংওয়ালা জিপে বসে, আড়চোখে গাড়িগুলোকে রোজ দেখি— আর ক্ষোভে হিংসায় পাটকাঠির মতো দাউদাউ করে জ্বলি। এক একটি গাড়ির দাম সোয়ালাখ; দেড় লাখ। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন থেকে কেনেন ভদ্রলোক।

হঠাৎ রঞ্জন বলল, যতি, তুই চিনে খেতে খুব ভালবাসিস, না?

এই প্রশ্নে যতি চমকে বলল, কেন? এর মানে কী হল?

রঞ্জন একটু ভেবে বলল, তোর জিপ যদি তুই ওই গাড়ির ঘাড়ে তুলে দিতে পারিস কখনও, তো তোকে তিন দিন চিনে খাওয়াব।

যতির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। চিনে খাবার লোভে নয়, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝেছে ও— আমিও বুঝেছি।

বললাম, আমিও তিন দিন চিনে খাওয়াব।

যতির চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হল। দপদপ করতে লাগল। বলল, গাড়িটার বাম্পার দেখেছ— কেমন নিচু— জিপকে একবার ঘাড়ে চড়াতে পারলে পেছনের কাচ এবং এয়ার-কন্ডিশনার-টনার ভেঙে একেবারে সিটের উপর পৌঁছে যাব।

এই অবধি বলেই হঠাৎ মুষড়ে পড়ে বলল, কিন্তু তা হবার নয়—। এ গাড়ির যা

স্পিড, এ তো ক্যাঙারুর মতো দৌড়োবে— এ গাড়িকে পেছন দিয়ে গিয়ে ধরা, জিপ গাড়ির কর্ম নয়— তবে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে সামনাসামনি যদি কোনওদিন পাই তো "জয়, বজরঙ্গবলীকা জয়" বলে একেবারে মুখোমুখি লড়িয়ে দেব।

তারপর যো হোগা, সো হোগা।

আমি বললাম, সামনাসামনি মারলে তো সামনের সিটের লোকও মরে যেতে পারে।

যতি বলল, তা তো পারেই। তুমি বেশ কথা বলছ বটে। ছ'দিন চিনে খাব— আর তার বদলে এক-দু'জন লোক মরবে না? আমাদের জীবনের দাম কি এতই বেশি নাকি?

রঞ্জন ওকে নিরস্ত করার জন্যে বলল, দ্যাখ যতি, বেশি বাড়াবাড়ি করতে যাস না—সবটাতে তোর জ্ঞান দেওয়া স্বভাব হয়ে গেছে।

৩

কবে নয়নাকে প্রথম দেখেছিলাম ভাল করে মনে পড়ে না।

যা মনে পড়ে তা হচ্ছে একদিন গ্রীষ্ম গোধূলিতে সুজয়দের বাড়ি-যাওয়া। সুজয়ের সঙ্গে তখন প্রথম আলাপ। কলেজে মাখামাখি হয়েছে, কিন্তু কখনও আমি ওদের বাড়ি যাইনি। সেই সময় আমাদের বাড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে হত বলে কলেজ-ফেরতা ও আমার সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত। মানে, তখন কলেজে মাখামাখি হয়েছে, সাহিত্যালোচনা হয়েছে, জীবনে প্রথমে একসঙ্গে সিগারেট খেয়ে নিজেদের প্রাজ্ঞ মনে করা হয়েছে। এমনি সময় একদিন সুজয় ফোন করে বলল, আয় না ঋজু, বাড়িতে আছি। আমাদের বাড়ি একদিনও তো এলি না।

বিকেলের মেহগিনি আলোয় একদিন ওদের বাড়িতে এসে পৌঁছোলাম। বাড়ির ভিতরে, লনের কোনায় গোয়ালা দুধ দোয়াচ্ছিল, তার পাশে একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের ছিপছিপে সপ্রতিভ মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুঁউক-চাঁক—চুঁউক-চাঁক আওয়াজ করে গোয়ালা কী করে দুধ্লি গোরুর গোলাপি বোঁটা থেকে দুধ নিংড়ে বের করছিল তাই দেখছিল।

শুধোলাম, সুজয় আছে?

মেয়েটি প্রথমে অবাক হল। গেটের পাশের দরোয়ানের শূন্য টুলের দিকে একবার তাকাল। তারপর সপ্রতিভ গলায় বলল, আপনি ঋজুদা?

হ্যাঁ। তুমি কে?

আমি নয়না। আপনার বন্ধু সুজয় আমার দাদা। এই অবধি বলেই বকনা বাছুরের মতো মাথা দুলিয়ে, দুই বিনুনি ছুড়ে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে ও বসবার ঘরে বসাল। পরদা ঠেলে বসবার ঘরে ঢুকলাম। সোফায় বসলাম। সেদিন বুঝতে পারিনি,

পরে এই ঘরটি, এই আদর, এই অতিথিপরায়ণ সহজ বাধাবন্ধহীন আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়েটির আকর্ষণ আমার কাছে এমনি দুর্বার হয়ে উঠবে।

সেই প্রথমদিনে, নয়নাকে বন্ধুর ছোট বোন হিসেবে, চটপটে কমনীয় একটি মেয়ে বলেই ভাল লেগেছিল। তার চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়নি। অন্য কিছু ভাবিওনি। সেই নয়না আর আজকের নয়নায় কোনও মিল নেই। সব মেয়েরাই বোধহয় দ্বিজ। যৌবনে ওরা প্রত্যেকে নতুন করে জন্মায়।

তারপর একটি একটি করে বুড়ি বছরগুলি হাওয়ার সওয়ার হয়ে নিমগাছের পাতার মতো ঝরে গেছে। দুপুরের ক্লান্ত কাকের মতো কা-খ্বা—কা-খ্বা করে প্রথম যৌবনের অস্বস্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। বেগুনি প্যাশান-ফ্লাওয়ারের মতো সুগন্ধি স্বপ্ন দেখেছি এবং একদিন এক জিয়াভরলি ভোরে আবিষ্কার করেছি যে, নয়না আর আমার কাছে শুধু সুজয়ের বোন মাত্র নয়। সে আমার অজানিতে আমার নয়ন-মণি হয়ে উঠেছে। ঠিক কোন সময় থেকে যে সে আমার মনে, অনবধানে, একটি কৃষ্ণসার হরিণীর মতো সুন্দরী, কাকাতুয়ার মতো নরম এবং মৌটুসি পাখির মতো সোহাগী হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারিনি। সেই ভোরে, হঠাৎ দরজা খুলেই মনের উঠোনে পত্রপল্লব বিস্তার করা রঙিন কৃষ্ণচূড়ার মতো তার মঞ্জরিত ব্যক্তিত্বকে অনুভব করে আমার সমস্ত সত্তায় শিরশিরানি লেগেছে।

সুগতকে মাঝে মাঝে বলতাম নয়নার কথা। ও আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে শুনত। ও নয়না কি সুজয় কাউকেই চিনত না। ওকে বেশি কিছু বলতে গেলেই ও আমার মুখ চেপে ধরত। বলত, পাগলা ছেলে, এসব কথা বলতে নেই— এসব যে একান্ত কথা। সোডার বোতলের ছিপি খুলে ফেললে সে যেমন সমস্ত ঝাঁজ, গন্ধ, আবেগ হারায়, সে যেমন নিঃশেষে বিড়বিড় করে ফুরিয়ে যায়— তুমিও তেমনি ফুরিয়ে যাবে। এসব কথা কাউকে বলতে নেই। কেবল নিজের মধ্যে দামি আতরের গন্ধের মতো, জঙ্গলে চাঁদনি-রাতে হঠাৎ শোনা কোনও পাখির ডাকের ভাললাগার মতো নিজের একান্ত করে রাখতে হয়।

তারপর সুগত শুধোত, তুমি যে ভালবেসে ফেলেছ তা জানলে কী করে? ভালবাসা আর ভাল-লাগায় তফাত জানো?

আমি অবোধের মতো মাথা নাড়তাম।

ও নিজেই উত্তর দিত। বলত, ভালবাসায় বড় দায়, বড় ঝুঁকি, বড় ব্যথা। ভালবাসার সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে— সে ঝড়ে হারিয়ে যায় কত লোক। কূল খুঁজে পায় না। নৌকো ডুবে যায়। কিন্তু তবু, সোজা, সমস্ত জোরের সঙ্গে দাঁড় বেয়ে তাকে চলতে হয়; যে ভালবাসে সে কখনও ভয় পায় না— ভালবাসার জন্যে সে নিজের সাধ্যাতীত অনেক কিছু করে ফেলতে পারে।

শুধোতাম, আর ভাল-লাগা?

ভাল-লাগা কী জানো? দোতলার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে দেখলে পথ দিয়ে একটি ফুটফুটে মেয়ে শরৎ-সকালের শিউলির মতো হেঁটে যাচ্ছে। তুমি মনে

মনে বললে, বাঃ, বেশ তো!

ব্যস। ওই পর্যন্ত। সে যেই মোড় ঘুরল— ভিড়ে হারিয়ে গেল— তোমার ভাল-লাগাও ফুরিয়ে গেল। ভাল লাগলে মানুষ ভাল-লাগাকে তার ইচ্ছাধীন করে রাখতে পারে, কিন্তু ভালবাসলে মানুষ নিজেই ভালবাসার ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে। তার নিজের কোনও নিজস্ব সত্তা থাকে না। ভালবাসা তাকে যা করতে বলে, পোষা পুষির মতো সে তাই করে।

সত্যি। সুগত যে কত কী জানে, কত কী ভাবে! কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে। অথচ আমি কেবল পাগলামি করে বেড়াই। বুদ্ধি বলে কিছুই হল না এ পর্যন্ত। মস্তিষ্ক অসাড় করে সব কিছু জমেছে গিয়ে হৃদয়ে। নড়লে-চড়লে হৃদয়টাই শুধু ঝুমঝুমিয়ে বাজে।

শিশুর মতো বায়না ধরি, অথচ বৃদ্ধের মতো অপারগ হয়ে বসে থাকি। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। নিজেকে শিকারের যোধপুরি বুট পরে লাথি মারতে ইচ্ছা করে।

ঠিক কোন সময় থেকে নয়নাও আমার প্রতি কৌতূহলী চোখে চাইতে আরম্ভ করছিল তাও মনে নেই। তবে মনে হয়, প্রথম আমার চিঠি পেয়ে। চিঠি লিখতে কখনও আলস্য বোধ করিনি। এবং সে কারণে, যখনই যেখানে গেছি সেখান থেকে চিঠি লিখেছি চেনা পরিচিত অনেককে, তার মধ্যে নয়না ছিল অন্যতমা। মনে হয় আমার চিঠির আয়নায় সে তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখটিকে প্রথম আবিষ্কার করে। তারপর প্রতিটি চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ও নিজেকে চিনতে পারে, নিজের প্রতি ওর মমত্ববোধ জাগে— এত বড় কলকাতা শহরের অগণ্য মেয়েদের মধ্যে ও যে বিশিষ্টা— ও যে নিজের পরিচয়ে পরিচিতা, ও হাসলে ওকে যে সুন্দর দেখায়, ওর চোখে যে অন্ধকারে বুদ্ধির জোনাকি জ্বলে, ওর কাছে এলেই যে কেউ ভাল-লাগায় মরে যেতে পারে, এত সব অনাবিষ্কৃত তথ্য ও বোধহয় আমার চিঠি পাবার আগে জানত না। এবং দিনে দিনে ও ঠিক যে অনুপাতে গর্বিতা, মহতী ও খুশি হয়ে উঠতে থাকে, আমি ঠিক সেই অনুপাতে হীনমন্য ক্ষুদ্র ও অখুশি হয়ে উঠতে থাকি। এও এক ধরনের আত্মাবলুপ্তি। স্লিপিং পিল খেলে এক মুহূর্তে হত। এমনি ভাবে তিলে তিলে হচ্ছে।

কিন্তু শুধু যে আত্মাবলুপ্তিই ঘটছে তাই বা বলি কী করে? নয়নাকে ভালবেসে আমি নিজের অযোগ্য অনেক মহৎ কর্মই করে ফেলেছি এ পর্যন্ত, যা ওকে ভাল না বাসলে করতে পারতাম কি না আমার সন্দেহ আছে।

স্যার উইনস্টন চার্চিল বিরোধী পক্ষের একজন পার্লামেন্টারিয়ানকে একদিন বলেছিলেন, The honourable member should not have more indignation than he can contain. তেমনি আমারও নিজেকে বলতে ইচ্ছে করত, I should not have more greatness than I contain,

একদিন সকালে বাড়িতে বসে আছি— শাল জড়িয়ে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে।

অস্বাভাবিক ঠান্ডা। রোদে, আরামে বসে চা খাচ্ছি— এমন সময় নাপিতটি এল। ইদানীং ও সপ্তাহে দু'বার করে আসছে। হাত-পায়ের নখ ইত্যাদি কাটে। ও একটি পাতলা সুতির জামা গায়ে দিয়েছিল। শীতে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে আমি বসে ছিলাম। বাগানে এক ফালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে। একটি বহুরূপী লনের শিশির-ভেজা ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। একটি শালিক হলুদ হলুদ পা ফেলে ফেলে একা একা মুখ গোমড়া করে হাঁটছিল, এমন সময় অন্য একটি উড়ে এসে ওর গায়ে ঢলে পড়ল। One for sorrow; Two for joy.

ভীষণ খুশি খুশি লাগতে লাগল। নয়নার কথা মনে হল। এখন নয়না কী করছে? ঘুম থেকে নিশ্চয়ই ওঠেনি। বড় দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে ও। এত দেরি করে উঠলে তো চলবে না। রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙার আগে উঠে, চান করে নেবে ও— তারপর সুগন্ধি খোলা চুল নিয়ে, জানালা খুলে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ভোরের রোদকে ঘরে ডেকে, আমাকে বলবে— এই! আর কত ঘুমোনো হবে? ক'টা বেজেছে জানো?

আমি বলব, উঁউঁম্-ম-ম-ম...। তারপর বলব, জানি। বারোটা।

ও বলবে, সবসময় ইয়ারকি, না?

এই আবেশে, অনিমেষে, এ সব ভাবছি, এমন সময় নাপিতটি এল। এমন সময় ও আমার অমন স্বপ্নভরা চোখের সামনে শীতে কাঁপতে লাগল। কী হয়ে গেল জানি না। শালটি গা থেকে খুলে ফেললাম। বোধহয় আমি নিজে খুললাম না। নয়নার অদৃশ্য লতানো হাত দু'খানি আমার গা থেকে শালটি আলতো করে খুলে নিল। তারপর নাপিতটিকে বললাম— নাও, নাও, গায়ে জড়িয়ে নাও; করেছ কী? নিউমোনিয়া হবে যে।

আমার কিন্তু একটিমাত্রই শাল ছিল। এরপর বিয়েবাড়ি যেতে হলে ধার করতে হবে। দিদি জানতে পেরে খুব বকবেন। বলবেন, ভাই আমার জমিদার হয়েছেন!

আমি জবাবে কিছুই বলব না। মাথা নিচু করে থাকব। দিদিকে আমি কী করে বোঝাব যে, যে মুহূর্তে আমি শালটি দান করেছিলাম, সে মুহূর্তে কোনও সামান্য জমিদার তো দূরের কথা, আমি হায়দরাবাদের নিজাম হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মতো বড়লোক আর কে ছিল?

কিন্তু ওসব কিছুই আমি বলতে পারব না। দিদি লোককে বলবে, ঋজুর আমার মনটা ভীষণ বড়। দিদি জানবেন না যে, তাঁর ঋজুর মনটা বড় নয়। খোঁড়া ভিখিরিকেও সে পয়সা না দিয়ে বিদায় দেয় ধমক দিয়ে, কিন্তু নয়না যখন পাশে থাকে, মানে, নয়না যখন মনে মনে তার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়— তখন সে ম—স্ত হয়ে যায়। বিরাট, বিরাট,— সি আর দাশের চেয়েও বড় দাতা হয়ে যায়। তখন সে নিজের যা কিছু আছে সব দিতে পারে।

সুজয় নেমন্তন্ন করতে এসেছিল সেদিন। বলল, আমার দিদির বিয়ে। ময়নাদির বিয়ে, তোর সকাল থেকে যেতে হবে কিন্তু— কাজকর্ম করতে হবে।

বললাম, দ্যাখ, নিজের দিদির বিয়েতেই কাজকর্ম করিনি। আমি একেবারে অকর্মা। তবে, যখন অতিথি-অভ্যাগতরা আসবেন তখন তাদের আসুন-বসুন করতে পারি। তার বেশি আমার দ্বারা হবে না। ভার দিলেও সব গোলমাল করে দেব।

সুজয় বলল, আরে সেটাই কি কম কাজ? আমার মা কী বলেন জানিস? বলেন, নেওতা-নেমন্তনে কেউ কারও বাড়ি খেতে আসে না। ভালমন্দ সকলেই বাড়িতে খায়। তাই এসব সামাজিক ব্যাপারে আদর-আপ্যায়নটাই বড় কথা। তার জন্যেই লোকের দরকার।

বললাম, তা হলে তো ভালই।

বিয়ের দিন সকাল সকাল গিয়ে পৌঁছোলাম। সুজয়দের লনে, পাশের প্যাসেজে এবং রাস্তায় শামিয়ানা ঘেরা হয়েছে। ব্যাঙের মতো হলুদ-রঙা ভাড়াকরা চেয়ার পাতা হয়েছে সারি দিয়ে। অনেক লোকজন। ব্যস্ত-সমস্ত। সানাইওয়ালা আনেনি ওরা। অ্যামপ্লিগ্রামে লং প্লেয়িং রেকর্ড বাজছে।

সামনে দিয়ে অনেক লোক আসছে যাচ্ছে। সুজয়ের মা একবার বাইরে এলেন দেখতে, মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেল কেমন হয়েছে। আমায় দেখে বললেন, কী বাবা, এসেছ? নিজের মতো করে আদর আপ্যায়ন কোরো লোকজনকে। এটা তো তোমার নিজেরই বাড়ি।

মাসিমাকে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু এ বাড়ি আমার নিজের বাড়ি ভাবতে খুব ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। যতির কাছ থেকে ধার-করা শালটা এত ছোট হয়েছে, যে, ভাল করে শীত মানছে না।

এবার লোকজন আসতে আরম্ভ করল। একটার পর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে— কেউ কেউ ট্যাক্সিতে, কি হেঁটেও আসছেন। ফ্লুরোসেন্ট ডে-লাইটে ফরসা লোকেদের ঠাকুমার কোলবালিশের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। আর কালো লোকেদের বেগুনিরঙা শিমের মতো মনে হচ্ছে। আলোয় মেয়েদের গয়না ঝিকমিক করছে। কয়েকটি অল্পবয়সি ছেলে টাইট-ফিটিং টেরিলিন-টেরিকটের সুট পরে এসেছে। আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আসছে। ইচ্ছে করছে হঠাৎ পা বাড়িয়ে দিই; মুখ থুবড়ে পড়ুক। বুঝতাম, অফিস-কাছারি থেকে সোজা আসছে, তাও নয়। সারাদিন ঘুমিয়ে কি আড্ডা মেরে, এখন শৌখিন সুট পরে আত্মীয়বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। কোনদিন মাড়োয়ারি ছেলেদের মতো সুট পরে, পাঞ্জাবি ছেলেদের মতো হাতে বালা পরে, মেক্সিকান ছেলেদের মতো চোখা জুতো পরে, এবং বিটলসদের মতো এক মাথা কাকের-বাসা চুল নিয়ে বাঙালির ছেলে হয়তো বিয়েও করতে

যাবে। জানি না, একদিন হয়তো চোখে সবই সয়ে যাবে।

এদিকে 'আসুন' 'আসুন' করে তো হাঁপিয়ে উঠলাম। যে আসছে, তাকেই গাড়ির দরজা খুলে নামাচ্ছি। মধুর হাসি হেসে পথ দেখিয়ে যাচ্ছি। তারপর মহিলাদের বাড়ির মহিলামহলে, এবং পুরুষদের হলুদ কাঠের চেয়ারে সমর্পণ করছি।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটা সাদা হেরাল্ড। বাঁ দিকের দরজা খুলতেই এক মোটা ভদ্রমহিলা (অল্পবয়সি) নামবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চেষ্টা করলেই তো হল না। ওই চেহারা নিয়ে হেরাল্ড গাড়ির গর্ত থেকে বেরুনো সোজা কর্ম নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আজ আমার করণীয় কর্তব্যের মধ্যে কোনও স্থূলকায়া ময়দা-ঠাসা-নাদুস মহিলাকে গাড়ি থেকে হাতে ধরে টেনে নামানোও পড়ে কি না, এমন সময়, যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি কটাং শব্দ করে হেরাল্ডের দরজা খুলে স্ত্রীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

কী সর্বনাশ। এ যে অনিমেষ। আমাদের কলেজেই পড়ত। আমাদের চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র ছিল। আমরা বলতাম অনিমেষ গুন্ডা। একবার ইন্টারক্লাস ক্রিকেট ম্যাচে আমার ইনস্যুয়িং বলে আউট হয়ে রেগে গিয়ে আমাকে খুব মেরেছিল। ওকে দেখে রাগে গা চিড়বিড় করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিমুখে বললাম, 'আসুন আসুন'।

ও আমাকে চিনতে পেরে অবাক হল। মুখের বিগলিত অবস্থা দেখে বুঝলাম, সুজয়রা নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়। স্ত্রীকে উদ্ধার করে আমার হাতে দিতেই আমি মহিলামহলে পৌঁছে দিলাম। গাড়ি পার্ক করিয়ে ও যখন আবার গেটে এল, আবার বললাম, 'আসুন' 'আসুন'— ও খুব কাছে এল— একদম মুখের কাছে মুখ নিয়ে 'হুঁকোমুখো'র মতো হিমেল হাসি হেসে বলল, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

বাক্যব্যয় না করে চলে এলাম। যতির শালটায় নাক ফেটে রক্ত-টক্ত পড়লে কেলেঙ্কারি হবে। বললাম, আচ্ছা বসুন, বসুন। বলেই, সরে এলাম।

এবারে নয়নার উপর আমার সত্যিই রাগ হচ্ছিল। সেই বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটেতে এসেছি— রাত ন'টা বাজতে চলল। এখনও কি একবার সময় করে নীচে আসতে পারল না? কতগুলো বাজে বন্ধু জুটেছে। খালি হি-হি আর হা-হা। বন্ধুগুলোই ওর মাথা খাবে। এবং আমারও সর্বনাশ করবে।

আলোর নীচে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছি, এমন সময় রাজেন্দ্রাণী এলেন। ওকে সাজলে-গুজলে রাজেন্দ্রাণী ছাড়া আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না আমার। আর কিছু মনে আসে না।

একটি নীল-রঙা বেনারসি পরেছে। রুপোর ফুল তোলা। চুড়ো করে খোঁপা বেঁধেছে। ওর গ্রীবাটি এত সুন্দর যে ও আমার কাছে এলেই ওর গ্রীবায় আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে। হাতে হালকা গয়না পরেছে, পায়ে পাঁয়জোর। পা ফেললেই ঝুনুর ঝুনুর করে বাজছে— আর আমার বুকের মধ্যে রক্ত ছলাত ছলাত করে উঠছে।

নাজিমসাহেব টুটিলাওয়াতে উর্দু কবিতা শুনিয়েছিলেন— নয়না সাজগোজ করলেই আমার সেই শায়রীর কথা মনে পড়ে:

উল্‌ঝি সুল্‌ঝি রহনে দেও,
কিঁউ শরপর্ আফৎ লাতি হো?
দিল্‌কা ধড়কান বাড়তি হ্যায়
যব, বাঁলোকো সুল্‌ঝাতি হো।

মানে, তুমি উসকোখুসকোই থেকো—। সেজেগুজে, চুল পরিপাটি করে আমার শিরে নতুন করে বিপদ ডেকে এনো না। তুমি কি জানো না, তুমি সুন্দর করে সাজলে আমার বুকের মধ্যেটা কেমন করে?

এলেন। এতক্ষণে এলেন। যেন রাধারানি এলেন। গর্বিতা, সুস্মিতা, আত্মবিশ্বাসে উত্তিষ্ঠিতা, কিন্তু আত্মসচেতন নয়। ও যদি ওর কী আছে জানত তবে ওকে আমার ভাল লাগত না। চলতে ফিরতে ওর অজানিতে আমার জন্যে অচেতনে ও যা উপচে ফেলে যায়, কোনও সুখী সাঁওতাল ছেলের মতো, বৈশাখী সকালের ঝরে-পড়া মিষ্টি মহুয়া ফলের মতো তা আমি কুড়িয়ে বেড়াই। ও জানে না— কী সুবাস, কী স্বাদ, কী ভাল-লাগা ও আমার জন্যে রেখে যায়— যখনই ও কাছে আসে।

নয়না এক ভদ্রমহিলাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল গাড়ি অবধি। ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। এবার ও আমার দিকে ফিরল। ফ্লুরোসেন্ট আলোতে ওকে স্বপ্নময় দেখাচ্ছে। সন্ধে থেকে, সব-বয়সি কত সুন্দরীই তো এই আলোর নীচে এসে আমার সামনে দাঁড়াল— কই, এমন তো আর কাউকে লাগল না?

ও কাছে এল, একটু হাসল, কপাল থেকে এলোমেলো অলকগুলি সরাতে সরাতে বলল, খুব কাজ করছেন?

ভী—ষণ। তুমি তো ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ।

তা তো বলবেনই। পা-টা যে কী ব্যথা করছে না। কতবা-র যে উপর-নীচ করলাম। সোজা উঠলে বোধহয় কেদারবদরী পৌঁছে যেতাম।

বললাম, চেষ্টা করলেও পারতে না। দুষ্টু লোকেরা সেখানে যেতে পারে না।

ও বলল, আপনাকে বলেছে! পাপীরাই তো পাপমুক্তি ঘটাতে যায় সেখানে।

কে যেন ওকে ডাকল। ও গিয়ে দুটি কথা বলেই আবার ফিরে এল, বলল, খুব খিদে পেয়েছে, না?

বললাম, খু-ব।

ইস। বেচ্চা— রা। আর একটু কষ্ট করুন। একসঙ্গে আমরা বসে খাব।

তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বিয়েতেও আমি খুব কাজ করে দেব; দেখবেন।

বলছ?

ও উত্তর না দিয়ে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি হঠাৎ বললাম, যাও। গল্প কোরো না। কাজ করো গিয়ে।

ও চলে গেল।

নিজের গালে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে করল। আমি যেন মাতব্বর জ্যাঠামশাই হয়ে গেছি। ওর যেন আমিই গার্জেন, যেন আমার উপদেশেই ও চলে। এতক্ষণ ওকে একটু দেখতে পাবার জন্যে ছটফট করেছি— যখন ও কাছে এল, ভাল লাগায় মরে গেলাম; অথচ ওর উপস্থিতিটা পুরোপুরি উপভোগ করার আগেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে বললাম, যাও, কাজ করো গিয়ে।

এখন কেমন লাগছে? তখন তো বিশ্বামিত্র মুনির মতো ভাব দেখালাম, এখন ও যে পথে চলে গেল সে পথে চেয়ে আছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটা ঢাউস গাড়ি এসে গেল।

আর নয়নার কথা ভাবা গেল না।

ওল্ডসমোবাইল—। কালো কুচকুচে। একী? পাধামশায় যে। আমাদের কোম্পানির কাস্টোমার। হাওড়ার শ্রীরাম ঢ্যাং লেনে মস্ত কারখানা।

আমাকে দেখে তিনিও অবাক।

আরে, বোসসাহেব? এখানে?

এই আমার বন্ধুর দিদির বিয়ে।

বাঃ বাঃ, বেশ বেশ।

আপ্যায়ন করে বললাম, চলুন চলুন, বসবেন চলুন।

উনি একটি চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটা 'কে-রে কে-রে?' করে উঠল। মনে হল বলল, যত ভাড়া দেওয়া হয়েছে তাতে এত মোটা লোকের বসার কড়ার ছিল না। রাজার-বেটার মতো বুক চিতিয়ে বসে, পাধামশায় রুপোর সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন এবং আমায় অফার করলেন।

বললাম, এ গুরুজন-অধ্যুষিত জায়গা। এখানে চলবে না।

ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। পাতা-কাটা চুল, হাতির দাঁত-বাঁধানো লাঠি, গিলে-করা ধুতি, ফিনফিনে আদ্দির গাড়োয়ানি গা-দেখানো পাঞ্জাবি। এ সব স্পেসিমেন আজকাল ভারতীয় গন্ডারের মতো দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে।

পাধামশায় ফিসফিসে গলায় বললেন, আমার ছেলে বলছিল আপনি নাকি কাগজপত্রে আজকাল গল্প-টল্প নেকেন? আসলে কাকে দিয়ে নেকান? আমার গাঁয়ের মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা ধরেছে একটি সাহিত্যসভার বক্তৃতা দিতে হবে। ভদ্রলোককে একবার আমার কাছে পাটিয়ে দেবেন? পয়সা কড়ি ভালই দোব।

বিনীতভাবেই বললাম, আজ্ঞে কাউকে দিয়ে লেখাই না, আমি নিজেই লিখি।

সে কী মশায়? ক'পয়সা পান নিকে?

বললাম, আমি একেবারে নতুন। সামান্যই পাই, এই চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা এক একটি লেখায়— বড় লেখা হলে আরও বেশিও পাই।

সে কী? আধঘণ্টা আপনার ডেস্কে বসে একটা ড্রইং করলেই তো দু'শো টাকা পেতে পারেন। তা হলে কী দরকার এ সবের?

একটা জুতসই উত্তর ঠোঁটের গোড়ায় এল, কিন্তু হেসে বললাম, এই আর কী!

উনি খুব হাসলেন, যেন উত্তরটা যে বুঝলেন শুধু তাই নয়, যেন মনোমতোও হয়েছে। হো-হো করে হেসে বললেন, তাই বলুন। সেই আর কী!

এখন আর ভাল লাগছে না। আগামী কাল শেষ রাতে উঠে পলাশী যেতে হবে। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে। পলাশীতে একটি কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে। শীতটাও রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ঘড়িতে প্রায় দশটা বাজে।

সুজয়ের সঙ্গে দেখা করে ওকে বললাম, যাচ্ছি। স্বাভাবিক কারণে ও বলল, যাঃ তা কী করে হয়? এত খাটাখাটনি করলি, না খেয়ে যাবি?

বললাম, তোদের বাড়ি খাইনি কখনও এমন তো হয়নি। না-গেলেই চলবে না রে এখন। ভোর সাড়ে-চারটেয় ট্রেন।

ও বলল, তা হলে আর কারও সঙ্গে দেখা করিস না। দেখা করলেই আটকে যাবি। তুই চলে যা, আমি ম্যানেজ করে নেব, মা আর নয়নাকে।

বাড়ি আসতে আসতে ভাবলাম— সাড়ে চারটেয় ট্রেন তো কী? ইচ্ছে করলে কি আর রাত বারোটা অবধি থাকতে পারতাম না? আগে কি আর কখনও এমন করিনি? আসলে চলে এলাম অনেক কথা ভেবে। ভাবলাম, সব অতিথি-অভ্যাগতদের বিদায় জানিয়ে নয়না যখন গেটে এসে দাঁড়াবে— দেখবে একটি ভিখিরির ছেলে ছেঁড়া কাপড়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে— কিছু খেতে চাইছে— নীল আলোয় বেচারিকে আরও নীল দেখাবে।

নয়না ভাববে, আরে? এখানেই তো ঋজুদা দাঁড়িয়ে ছিল— কোথায় গেল? যখন জানবে আমি নেই— তখন ওই ছেলেটির প্রতি নয়নার আরও বেশি সমবেদনা হবে। ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাতপেড়ে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়াবে। আমারও ইচ্ছে করে, কোনওদিন নয়না ওর মনের দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর শরীরের শামিয়ানার তলায় বসিয়ে ওই ভিখিরি ছেলেটির মতো করে আমাকেও সাধ মিটিয়ে খাওয়াবে।

ইচ্ছে তো কত কিছুই করে।

রসা রোডের মোড়ের লাল আলোতে দাঁড়ালাম।

বুঝলাম, সুজয়টা খুব বকুনি খাবে।

এক-ছাদ লোকের সামনে ক্লান্ত, অবসন্ন নয়না সুজয়কে খুব বকবে। বলবে, ইস তুমি কী দাদা? আমাকে ঋজুদা বলল পর্যন্ত যে ভীষণ খিদে পেয়েছে, আর তুমি চলে যেতে দিলে? খেয়ে যেতে কতক্ষণ লাগত? ও যখন সুজয়কে বকবে, আমি হয়তো তখন ঘুমিয়ে থাকব— বালিশে মুখ গুঁজে আমি ঘুমিয়ে থাকব— তা হলেও ঘুমের মধ্যেই আমার খুব ভাল লাগবে। মনটা ভরে উঠবে। ফ্র্যায়েড রাইস— রোস্ট চিকেন ইত্যাদি খেলে পেটটা হয়তো ভরত— কিন্তু এমন করে মনটা তো ভরত না।

শোবার ঘরে ঢুকে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খুব ভাল লাগতে লাগল।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটা বের করতে গিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা কী যেন লাগল হাতে। দেখি, রাংতা-মোড়া একটি লাল গোলাপ। নয়না দিয়েছিল, আমার সঙ্গে কথা বলে চলে যাবার সময়। গোলাপটাকে চুমু খেলাম। একদম নয়নার মতো গন্ধ গোলাপটার। হঠাৎ আয়নায় নিজেকে বেশ সুন্দর দেখতে লাগল। বেশ হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম। যদি সবসময় আমাকে এরকমই দেখাত তা হলে নিশ্চয়ই নয়না আমাকে ভালবাসত। ভগবান, তুমি আমার চেহারা নয়না যেমনটি পছন্দ করে তেমনটি করে করলে না কেন?

বড় খিদে পেয়েছে। অথচ বাড়িতে বলাও যাবে না যে খেয়ে আসিনি। মিনুরা তো সব খেয়ে-দেয়ে এসে শুয়ে পড়েছে। জেগে থাকলেও বলা যাবে না। ঠোঁট উলটে মিনু বলবে, তোর এমন ন্যাকামি না! কেন খেয়ে এলি না?

মিনুর মেয়ে মিঠুয়াকে দেবার জন্যে একটি ক্যাডবেরি কিনেছিলাম। ড্রয়ার খুলে বের করে অগত্যা সেটিকেই খেলাম কুরকুর করে। তারপর ঢকাস ঢকাস করে দু'গেলাস জল খেয়ে কম্বলের নীচে বডি-থ্রো দিলাম।

৫

গাড়িভরা ঘুম, কামরা নিঝুম।

শীতকালের রাত চারটে অনেক রাত। কোনওক্রমে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একটি বান্ডিলের মতো এসে হোল্ডল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখনও অনেকক্ষণ ঘুমুনো যাবে। কূপেতে আমি একা। ভিতর থেকে লক করে দিয়ে কম্বল মুড়ে ঘুম লাগিয়েছিলাম।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার চলেছে। শীতের আধো-ফোটা ভোরে— রিকঝিক; রিকঝিক; রিকিঝিকি রিকিঝিকি— রিকঝিক রিকঝিক।

শুয়ে থাকতে থাকতে বুঝলাম, একসময় ভোর হল। চোখ মেললাম। বাইরে সোনালি রোদ— আকাশময় সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মনে হল, যেন এই সকালে কারওই কোনও দুঃখে ডুবে মরার ভয় নেই।

পায়ের কাছের জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে ধূসর কম্বলে লুটিয়ে পড়েছে।

শিকারে-টিকারে গিয়ে আমার যখন ভীষণ শীত করে, পাতার ঘরে কি কোনও ডাকবাংলোয় চৌপায়ায়, যখন একটি কি দুটি কম্বলেও শীত মানে না— ঠোঁট যখন ঠান্ডায় নীল হয়ে যায়, পায়ের পাতাদুটি হিমেল হাওয়ায় হিম হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আসে, তখন আমি নয়নার কথা ভাবি। নয়নাসোনার ভাবনা তখন কোনও চিকন পাখির পালকের লেপের মতো আমার কম্বলের তলায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়। আমার সমস্ত সত্তা উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে, ধীরে ধীরে। তারপর আমার সমস্ত আমিত্বে একটি মসৃণ চিতাবাঘের চেকনাই লাগে। শীত কাকে বলে আমি ভুলে যাই।

কিন্তু এই রেলগাড়ির কামরার সামান্য শীতে অতসব দরকার হয় না। এমনিই শুয়ে শুয়ে রোদ দেখলেই গা গরম হয়ে ওঠে। ভাল লাগে।

রানাঘাট বোধহয় এসে গেল। চা খেতে হবে। বার্থ ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। পলাশী আসতে এখনও অনেক দেরি। চা খাবার পর আরও কিছুক্ষণ আরাম করা যাবে।

রানাঘাট স্টেশনে চা নিলাম। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেই চা খেলাম। বেয়ারা এসে পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে গেল।

এবার লম্বা দৌড় দেবে গাড়ি।

গায়ের পাশের জানালাটি এবার খুলে দিলাম। উঠে বসলাম। বাইরে ভাল করে তাকালাম।

খেতে খেতে ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও শীতের আনাজ লেগেছে। শিশির-ভেজা সবুজ ঝোপে-ঝাড়ে প্রজাপতি ফুরফুর করছে। শুকনো খেতে পাখির ঝাঁক একরাশ চঞ্চল ভাবনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে; উড়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে আম-কাঁঠাল ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম। কাছাকাছি ভেরান্ডার বেড়া দেওয়া কাদালেপা বাড়ি। পুকুরপাড়ে হাঁস প্যাঁকপ্যাঁকাচ্ছে। কোথাও খোঁটায়-বাঁধা একলা ছাগল দার্শনিকের মতো একদিকে চেয়ে কত কী ভাবছে। বাঁশবনের ছায়ায় ছাতার পাখিরা পঞ্চায়েত বসিয়েছে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে পরনিন্দা পরচর্চা হচ্ছে।

সেই নদীটি এল।

কী নীল জল! যতবার নদীটি পেরুই প্রতিবারই নতুন করে ভাল লাগে। ছিপছিপে, নীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্না নদী। গুম গুম গুম গুম— গুম গুম গুম গুম করে লোহার কড়ি-বরগা পেরিয়ে রেলগাড়ি নদী পার হল। পার হয়েই ছুটল— রিকিঝিকি রিকিঝিকি রিকিঝিকি ঝিকিঝিকি।

বাইরের আদিগন্ত আকাশ আর সোনালি রোদ্দুরে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল যেন দূরে, রেলগাড়ির পাশে পাশে, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাল রাতের নীল বেনারসি পরে নয়নাসোনা শুঁটিখেতে, সরষেখেতে শাড়িতে ঢেউ তুলে তুলে ছুটে চলেছে। ওকে দৌড়োলে যা সুন্দর লাগে! চিকি-চুঙ-চিকি-চুঙ-টাকা-টাকা-টিকি-টঙ গাড়ির তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একবার ত্রিতালে, একবার কাহারবায়, একবার দাদরার ছন্দে নয়না আমার পাশে পাশে নীল বেনারসি পরে ছুটে চলেছে। যেন উড়ে উড়ে চলেছে। ওর পায়ের পাঁয়জোরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওর কোমরের রুপোর চাবির রিংয়ের ঝুনঝুনি শুনতে পাচ্ছি। নয়না আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। হাওয়ায় ওর শাড়ি ফুলে উঠছে— আঁচল দুলে দুলে উঠছে— চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দুলে দুলে, হাওয়ায় ফুলে ফুলে, ফুলের মতো ও কী যেন বলছে— হাওয়া আর চাকার শব্দ কথাগুলিকে নিয়ে কাপাস-তুলোর মতো উড়িয়ে দিচ্ছে— শুনতে পাচ্ছি না কিছু— কেবল বুকের কাছে নয়নার অস্তিত্ব অনুভব করছি। আমার সবটুকু ভাললাগা এই ভোরের রোদ্দুর হয়ে আকাশময়, মাঠময়, বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে।

মনে হল, ট্রেনটার গতি কমে এল। চাকাগুলো কুমিরের শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম নয়না নেই। নয়না আমার সঙ্গে আর দৌড়োচ্ছে না।

বীরনগরে পৌঁছে গেছে গাড়ি। বড় বড় সেগুন গাছ। সেগুন গাছের বন হয়ে আছে। স্টেশনের দু'পাশে। মনে হয় না, নদিয়া জেলায় আছি। গোদাপিয়াশাল বা শালবনী বলে মনে হয়।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল। সেগুনবনের আড়াল থেকে প্যাঁকু প্যাঁকু করে সাইকেল রিকশার হর্ন শোনা যাচ্ছে। প্লাটফর্মে একটি বিতিকিচ্ছিরি বিনতা বউ একটি নীল-রঙা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছে, বুঝি নীল-রঙা শাড়ি পরলেই নয়নার মতো দেখাবে। সঙ্গে, হলুদ শার্ট পরে নতুন বর। টোপর মাথায়।

বীরনগরে ক্রশিং হবে। এখানে সিঙ্গল লাইন। কৃষ্ণনগর থেকে ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার আসবে, তবে এ গাড়ি ছাড়বে। প্রতিবারই এমনি অপেক্ষা করতে হয়। কোনও এক গাড়ির। যে গাড়ি আগে আসে।

নয়না আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। একটু আগেও দেখেছিলাম। জানি না ও এখানে দৌড়ে আসছে কি না। কী বলছিল ও, শোনা হল না। বলছিল হয়তো— ঋজুদা, কাল আপনি না খেয়ে চলে এলেন বলে আমারও খাওয়া হল না। অসভ্য। না খেয়ে চলে এলেন কেন?

জানি না কী বলছিল।

জানি না, বীরনগরে আমাকে ও অপেক্ষা করতে বলেছিল কি না। দরকার হলে, মানে, ও এখানে আসবে জানলে, আমি আজীবন অপেক্ষা করতে পারি। শুধু এই জীবনই বা কেন? অনেক জীবন। জানি না আমি আর ও, একই সিঙ্গল লাইনে এই লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুটির মতো বিপরীত মুখে ছুটে আসছি কি না। নয়না কিন্তু আমার সঙ্গে একই দিকে ছুটছিল— আমার পাশে পাশে। সে জন্যেই ভয়। বিপরীত মুখে ছুটলে কোনও-না-কোনও শান্ত স্টেশনে আমাদের দেখা হয়ে যেতই যে, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতাম। কিন্তু একই দিকে ছুটছি বলে, আমি হয়তো যখন ঘুমিয়ে থাকব কামরাতে, ও হয়তো আমাকে পিছনে ফেলে কোনও অজানা স্টেশনের দিকে চলে যাবে— যার টিকিট আমার কাছে নেই। অথবা, এই কানীন্ রেলগাড়ির কামরার মতো কোনও কামরা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার অজানিতে, হয়তো আমার নয়নার কাছ থেকে আমায় দূরে, বহু দূরে নিয়ে চলে যাবে। কোনও স্টেশনেই হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না।

বড় ভয় করে। আমার বড় ভয় করে।

ঘণ্টা পড়ল। ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার আসছে। নীল বেনারসি পরা কুৎসিত বউটি একটু হাসল। বরটি যেন কী বলল। তারপর বিড়িটায় একটি শেষ সুখটান দিল।

ওদের দু'জনের জীবনের আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন বীরনগরের মতো কোনও

পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে ক্রসিং করেছে। ওদের দেখে খুব ভাল লাগল। ওরা হারিয়ে যায়নি। দু'জনে দু'জনকে হারিয়ে ফেলেনি।

এমন সময় গুম গুম করতে করতে অন্যদিক থেকে ট্রেনটি এসে ওদের মুখ দুটি আমার চোখ থেকে মুছে দিল। একটি খয়েরি চলমান রেখা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে থেমে গেল লাইনের উপর। আমার দাঁড়ানো কামরার তলা থেকে একটি ধবধবে বেড়াল লাফ দিয়ে নিচু প্ল্যাটফর্মে উঠল। দুষ্টুমি করে আমাকে একবার চোখ টিপল— তারপর শীতের রোদে আড়মোড়া ভেঙে আর এক লাফে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে সেগুন বনে লাফিয়ে নামল।

দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে পেছনের মাঠভরা সোনালি রোদ্দুরে তাকালাম। এখনও আমার নয়না দৌড়ে আসছে কি না তা দেখার জন্যে। দেখলাম, একটি সোহাগী নীলকণ্ঠ পাখি টেলিগ্রাফের তারে বসে আনন্দে গদগদ গলায় আপনমনে কী যেন স্বগতোক্তি করছে। এবং খুশি খুশি রোদ-ঠিকরানো ঠোঁটে মসৃণ পালক পরিষ্কার করছে। ওর গর্বিত মুখ দেখে মনে হল, এই নীল বেনারসি-পরা নিরিবিলি পাখিকেও বোধহয় আমার মতো করে অন্য কোনও নীলকণ্ঠ পাখি এই রোদ্দুর মাখা সকালে ভালবেসেছে। নইলে, ওর মুখ নয়নার মতো অমন নিরালা নরম দেখাত না।

৬

ভোরবেলা সামনের বাড়ির রেডিয়ো থেকে মুহূর্তবাহী "খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল"-এর ঘুম ভাঙানো সুর কানে এসে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল আজ দোল; আজ ছুটি।

ভোরবেলার প্রথম কাপ চা খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিপুণভাবে দাড়ি কামালাম। খবরের কাগজটা উলটে পালটে দেখলাম। কাল অফিস-ফেরতা একটি আনন্দবাজার দোলসংখ্যা কিনেছিলাম— সেইটে নিয়ে আরাম করে বারান্দায় ইজিচেয়ারে, মোড়ার উপর পা তুলে, মৌজ করে বসব। তার আগে অত্যাচারী আগন্তুকদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আলমারি খুলে একটা ছেঁড়া পায়জামা ও পাঞ্জাবি বের করলাম।

এমন সময় সুজয় ফোন করল, কী রে? কী করছিস? এদিকে আসবি না?

অতদূর হেঁটে কী করে যাব?

গাড়ি নিয়েই আয়।

সাদা গাড়ি। রং দেবে ভীষণ।

তুই কে রে একটা মস্তান যে, বেছে বেছে তোর গাড়িতেই রং দেবে?

কেউ নয় বলেই তো দেবে!

যাঃ যাঃ ইয়ারকি মারিস না। দ্যাখ, বিদেশে ঠান্ডায় গিয়ে পচে মরব— কত বছর দোল খেলতে পারব না কে জানে? এই আমার আপাতত শেষ দোল খেলা— আয়

না বাবা। মা ইয়া-ইয়া পান্তুয়া বানিয়েছে। নয়না কুচো নিমকি বানিয়েছে। একটু পর পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসবে। রমরমে কাণ্ড হবে। জানিস তো কলের 'ফেরুল' বাড়ানো হয়েছে। এবার আমাদের ওয়াটার-ফেস্টিভ্যালও খুব জমবে।

আমার সর্দি সর্দি হয়েছে। জল দিলে যাব না।

ও বলল, আমাকে অত ইনকনসিডারেট ভাবিস কেন? আমার ড্রয়ার ভরতি সেলিন ট্যাবলেট আছে— 'ভিটামিন সি'। আগে গোটা দুই খাইয়ে তারপর জল দেব। এমন সময় শুনলাম সুজয়ের পাশ থেকে কে যেন বলল, কে রে দাদা?

ও বলল, ঋজু।

আসতে চাইছে না?

না।

তারপরই নয়নার গলা শুনলাম।

কী হে মশাই— আসতে পারছেন না?

কেন যাব?

বন্ধুদের সঙ্গে রং খেলবেন— পান্তুয়া খাবেন— নিমকি খাবেন— মজা হবে— আর কেন?

আমার ওরকম চেঁচামেচি, বেশি হই-হট্টগোল ভাল লাগে না।

তো কীসে লাগে?

একা একা তোমার সঙ্গে গল্প করতে।

কোনও উত্তর দিল না ও।

কী? বুঝলে?

হুঁ!

হুঁ মানে? কী বুঝলে?

যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি।

হঠাৎ টোকা-খাওয়া টাকা-কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেলাম। আসলে আমার এই পাগলামি দেখে ও নিশ্চয়ই হাসে।

বোধহয় বন্ধুদের কাছে আমার গল্প করে, অফ-পিরিয়াডে বোধহয় আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে। সব বুঝি, মনে মনে লজ্জায়, অপমানে, প্রত্যাখ্যানে মরে থাকি— তবু বারে বারে ফিরে ফিরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। কোনও পুঁজিপতির মতো "নেহি হোগা; নেহি হোগা। চলো, হাঠো হিঁয়াসে" বলে ও আমাকে তাড়িয়ে দেয়। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু ওর নিস্পৃহতা দেখে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, আর মরমে মরে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার লজ্জাহীনের মতো ভিক্ষা চাই।

এই ঋজুদা!

কী?

আসুন না বাবা।

আমি গেলে তোমার ভাল লাগবে?

বেশ কিছুক্ষণ কথার উত্তর নেই।

তারপর বলল, আপনি জানেন না?

না।

তবে জানেন না।

বলো। বলো না? ভাল লাগবে কি না?

হুঁ।

আবার হুঁ। নাঃ। তোমাকে বলতেই হবে।

আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো আপনি। লাগবে। হল তো? আপনি যেন কী? কোনওদিন কি বড় হবেন না?

বড় হয়েছি বলেই তো এত যন্ত্রণা।

অত আমি বুঝি না। তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার জন্যে আমি বাঁদুরে রং গুলছি।

সুজয়দের বাড়ি গিয়ে যখন পৌছোলাম, তখন প্রায় দশটা। দেখলাম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধেছে। পাড়ার যত ছেলেমেয়ে সব ওদের বাড়িতে। নয়না একটা কালোর উপর লাল ফুল-তোলা বাঁধনি শাড়ি পরেছে। দৌড়াদৌড়িতে শাড়ির প্রান্তে কালো মোটা সিল্কের সায়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। মাথা— কপাল— শাড়ি— ব্লাউজ সব নানা রঙে রঙিন হয়ে গেছে। ওকে দেখে, কোনও ইম্প্রেশনিস্ট আর্টিস্টের চলমান ছবি বলে মনে হচ্ছে। ও কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে দলবদ্ধ হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই দলছুট হচ্ছে। ওর পায়ের পাতা দুটি শ্রীরাধার পায়ের মতো সুন্দর। পাতলা সরু দুটি পাতা। ইচ্ছে করে ধরে থাকি— মুখের সঙ্গে ঘষি।

সুজয়ের বন্ধুরা মিলে আমাকে অতর্কিতে ও অন্যায়ভাবে জবরদস্তির সঙ্গে রঙে রঙে ভূত করল, তারপর এ ওকে বালতি বালতি জল ঢালল! সকলে মিলে ভিজে ঝোড়ো-কাক। ওদের ছোট্ট লনটিতে আমরা বসলাম সবাই। মাসিমা পান্তুয়া পাঠালেন, সঙ্গে নিমকি। তারপর কফি। নয়নার বান্ধবীরা মিলে কোরাস গাইল, “ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।”

দোলের দিনে প্রতিটি লোকই হেরে যাবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত থাকে। বলবান লোক, কিশোরী মেয়ে, রূপসি বউদি সেদিন যে-কোনও ছোট ছেলে অথবা যে-কোনও অবাধ্য দেওরের কাছে হেরে যাবার জন্যে মনেপ্রাণে হন্যে হয়ে থাকে। আমি যেমন অনুক্ষণ ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে থাকি— এই একটি দিনে, সবাইকে তেমনি পরনির্ভর দেখি।

আমারও ইচ্ছে ছিল, নয়নার কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হব। ভেবেছিলাম, নয়না আমার খুব কাছে এসে যখন ওর সুন্দর সুরেলা আঙুল বুলিয়ে আমার সমস্ত সত্তাকে চাবি-টিপে-টিপে একটি উদ্‌বেল পিয়ানোর মতো বাজাবে, তখন আমি আমার স্বপ্নের খুব কাছাকাছি আসব। মুহূর্তিক যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাব। কিন্তু নয়না কিছুই করল না। কাছে এল। যথেষ্ট ব্যবধান রেখে আমার কপালে আবির দিল— পায়ে

আবির ছুঁইয়ে প্রণাম করল। আবির-মাখা মুখে, সুন্দর সুগন্ধি দাঁতে একফালি আশাবাদী রোদের মতো হাসল। তাতেই আনন্দে মরে গেলাম। ইচ্ছে করলে আশীর্বাদ করার ছুতোয় আমি ওকে কাছে টেনে আনতে পারতাম— ওর মুখকে আমার বুকে, ঝড়ের রাতের ভয়ার্ত পাখিকে ঝাঁকড়া ঝাউ গাছ যেমন করে আশ্রয় দেয়, তেমনি করে আশ্রয় দিতে পারতাম। জড়িয়ে থাকতাম থরথরানো শরীরলতাকে। কিন্তু কিছুই পারলাম না। যে আমি অনুক্ষণ ওকে কল্পনা করে কাঁদি— ওর সুরেলা শরীরকে স্বচ্ছন্দে কোমল 'নি'তে বাজাই, ওর নূপুরের মতো নিবিড় নাভিতে কল্পনায় অনিঃশেষ মৃগনাভির গন্ধ পাই, সেই আমি ওরই আঁচল থেকে একমুঠো বেগুনি আবির নিয়ে ওর মাথার উপরে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, দিস ইজ দ্য সোবার ওয়ে।

অন্য অনেক ছেলে নির্দ্বিধায় হয়তো যা করতে পারে— আমি তার কিছুই করতে পারি না। এমনকী, আমি যতখানি ভাল নই, নয়নার কাছে এলে আমি তাই হয়ে উঠি। আমার 'সত্যি আমি'র চেয়ে অনেক সংযত। যে কামনার ছুরি অনুক্ষণ হ্যাকস ব্লেডের মতো আমাকে চিরে চিরে চলে, ওর কাছে গেলে, কোনও অদৃশ্য মন্ত্রবলে আমার সেই সমস্ত কামনা শীতল শামুকের তুলতুলে শরীরের মতো বাইরের সংযমী আবরণের ভিতর মুখ লুকোয়। আমি অনেকদিন নিজেকে শুধিয়েছি— এ কি নিছক ভণ্ডামি? নিজেকে মহান করে লোকের সামনে তুলে ধরার কোনও নীচ প্রচেষ্টা? ধার করে অন্য লোকের মার্সিডিস গাড়ি চড়ার মতো এও কি কোনও সস্তা বড়লোকি? কিন্তু না। নিস্তব্ধ নির্জন বিকেলে অথবা কোনও হঠাৎ ঘুমভাঙা-রাতে নিজেকে বারবার শুধিয়ে এক জবাবই পেয়েছি। জুতো পায়ে যত ময়লাই মাড়াই না কেন— মন্দিরে যাবার আগে যেমন জুতো ছেড়ে রাখি বাইরে— নয়নাসোনার কাছে এলেও জুতো পায়ে আসার কথা আমি ভাবতে পারি না। ওর কাছ থেকে চলে এলেই আবার জুতো পরে ফেলি। লোক ঠকাই— ময়লা মাড়াই, কামনার অক্টোপাসের সঙ্গে কর্কশ কুস্তি করি। নয়নাসোনা আমার মন্দির।

পাশের বাড়ির দেবদারু গাছে একটি কোকিল ডাকছিল। ফুরফুর করে বসন্তের হাওয়া দিচ্ছিল। ভিজে পাঞ্জাবিতে গা'টা শিরশির করে উঠে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

এমন সময় সেই ছেলেটি এল। প্রথম দিন থেকেই আমি দু'চোখে একে দেখতে পারি না। নয়না যেন ওকে কী এক বিশেষ চোখে দেখে— কোনও বিশেষ কোণ থেকে। ছেলেটি ফরসা, লম্বা, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, পেটের কাছে একটি মাঝারি সাইজের নাদু। পান খেয়েছে। পায়জামা ও আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছে। গায়ের রং যে ফরসা তা দেখানোর জন্যে ইচ্ছে করেই বোধহয়, পিঠের কাছে অনেকখানি ছিঁড়ে রেখেছে। নীতীশ। মনে পড়েছে। এর নাম নীতীশ সেন। সেদিন সুজয় আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

কেন জানি না, এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে খুশির আলাপ করছিলাম, যে মহত্ত্বের জোড়কে গড়িয়ে গড়িয়ে ঔদার্যের মেরজাপ পরে একেবারে ঝনঝনে ঝালায় পৌঁছে

দিয়েছিলাম— এক লহমায় তার সব শেষ হয়ে গেল। ঝনাত করে তার ছিঁড়ে গেল, ঢপ করে বাঁয়ার মধ্যে হাত ঢুকে গেল। আমার সকালটাই মাটি হল।

নয়না এগিয়ে এসে আপ্যায়ন করে বলল, আসুন আসুন। ছেলেটি মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ে নয়নাকে আবির দিল। বেশ ভদ্রভাবেই দিল। কিন্তু আমি নয়নার মুখে চেয়ে বুঝতে পারলাম যে নিছক শটি-বাটা আবির, কপাল ভেদ করে আরও গভীরে প্রবেশ করল। আমার কানটা গরমে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল! মাথার মধ্যে ঝুনুক ঝুনুক করতে লাগল রক্ত। এত খারাপ লাগতে লাগল যে কী বলব। মনে হল ডেঙ্গু হয়েছে। গায়ে পায়ে ব্যথা। সারা গায়ে অবসাদ, বিরক্তি; মুখ বিস্বাদ। নয়না কি ছেলেটিকে ভালবাসে নাকি? ছেলেটিও বোধহয় ভালবাসে।

মনে হচ্ছে। এ সব ব্যাপারে আমার মনে-হওয়া মারাত্মক। এরকম মনে হওয়ার ক্ষমতা কোনও রেসুড়ের থাকলে সে কোটিপতি হয়ে যেত। আমার বারবার মনে হল, যা মনে হচ্ছে তা ঠিক।

ছোটবেলা থেকে নয়না ছেলেটিকে চেনে। সুজয়দের মতে, ওরকম ছেলে নাকি হয় না। ও নাকি আদর্শ ছেলে। তার মানে বুঝতেই পাচ্ছি। গুডি গুডি টাইপ। মানে ন্যাকা। খেঁকি কুকুরের লেজে তারাবাতি বেঁধে এইসব ছেলের দিকে লেলিয়ে দিতে হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাড়ির অবস্থা ভাল। শিলঙে কোন সাহেবি কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ওখানেই থাকে। দোলে-দুর্গোৎসবে কলকাতা চলে আসে প্লেনে। দিনকয় অন্তঃসলিলা চালিয়াতি করে চলে যায়।

ঠান্ডা মাথায় প্রতিপক্ষকে দেখতে লাগলাম। ষাঁড় যেমন বুল-ফাইটারকে দেখে। কীই-বা এমন ছেলে? হতে পারে আমার চেহারাটা ভাল না। কিন্তু পৃথিবীতে চেহারাই কি সব? হতে পারে ও চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট— কিন্তু তা বলে আমিও কি এঞ্জিনিয়র নই? ও লিখতে পারে? ছবি আঁকতে পারে? পারে না। ও খালি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ও খালি টাকা রোজগার করতে পারে আর পাঙাস মাছের মতো চোখ করে অন্য লোকের টাকার হিসাব রাখে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। ও আমার মতো করে ভালবাসতে পারে নয়নাকে? আমার মতো করে রাত্রি দিন, নীরবে ও সোচ্চারে নয়নাকে মনে করে? কিছুই করে না। অথচ, অথচ নয়না ভালবাসে ওকে। আমাকে নয়।

পায়ের কাছের একমুঠো কচি দূর্বা ফস করে হ্যাঁচকা টানে টেনে তুললাম। নয়নাদের অ্যালসেশিয়ানটা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমার কাছে এল। মনে মনে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললাম— গন্ধগোকুল কুত্তা— আমার কাছে কেন? অনেক সুগন্ধ ওদিকে আছে, যাও না শালা।

কেন এমন হয়, কেন এমন হল, জানি না। আমার সমস্ত খুশি, সমস্ত ভাল-লাগা এক লহমায় বিষাদে ভরে গেল। পৃথিবীতে বিষাদ ছাড়া আর কিছু যে আছে, তা চেষ্টা করেও মনে আনতে পারলাম না।

কেউ কেউ দ্বিতীয় কাপ কফি খাচ্ছিল। নয়না নিজে হাতে এক কাপ কফি এনে

আমাকে বলল, নিন। ও জানত, কফি আমি ভালবাসি এবং ভিজে জামা-কাপড়ে আর এক কাপ কফি না খাবার কোনও কারণ ছিল না। তবু ও কাছে এসে যে মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রীতিঝরানো হাসি হেসে বলল, নিন, ধরুন; সেই মুহূর্তে সব রাগ গিয়ে পড়ল ওর উপর। বললাম, খাব না।

ও বুঝতে পারল কোনও কারণে আমি অখুশি আছি। আরও কাছে এসে বলল, রাগ করেছেন আমার উপর?

ওর মুখের দিকে না চেয়েই অন্যদিকে চেয়ে বললাম, রাগ করার কোনও কারণ তো ঘটেনি। তবু আমার মুখে চেয়ে ও ব্যথিত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, খাবেন না? সত্যি?

আমি কোনও জবাবই দিলাম না।

অন্য অনেকে সেখানে ছিল। আর কিছুই না বলে ও কফিটা নিয়ে ফিরে গেল।

একটুক্ষণ বসে থাকার পরই আমার মনে হল যে, আমার এখানে আর থাকবার কোনও মানে নেই। আর একটুও থাকা-না-থাকা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমার কাছে তো বটেই—নয়নার কাছেও। এবং অন্য কারও মতামত নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

হঠাৎ উঠে পড়লাম। উঠে সুজয় ও মাসিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। নয়না গেটের কাছ অবধি পৌঁছে দিতে পর্যন্ত এল। আমার উচিত ছিল যে একটা ভদ্রতাসূচক "চলি" অন্তত বলি। কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে যে ভাবপ্রবণ জানোয়ারটা বাস করে সে নীরব রইল। দড়াম আওয়াজ করে অসভ্যর মতো দরজাটা বন্ধ করলাম। তারপর গাঁ গাঁ করে গাড়িময় কুৎসিত আর্তনাদ তুলে সোজা বাড়ি এসে পৌঁছোলাম। ঘরে বসে—চুপচাপ— একেবারে একা একা অনেকক্ষণ পাইপ খেলাম। তারপর চানঘরে ঢুকে শাওয়ার খুললাম। সমস্ত শরীরের রং— লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ, রুপালি, সোনালি, সব রং অহংকারের মতো, আমার অন্ধ আবেগের মতো গলে গলে পড়তে লাগল। চানঘরের আয়নায় সেই সিক্ত, পরিবর্তনশীল, বহু রঙে-রঙিন ছবি দেখে, হঠাৎ নিজেকে মনে হল এ কোনও অনাদিকালের বহুরূপী। একে আমি নিজেও কোনওদিন চিনিনি। সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে রং তুলতে তুলতে হঠাৎ নিজের উপর খুব রাগ হল, ঘৃণা হল, নিজেকে মারতে ইচ্ছা করল।

এত খারাপ লাগতে লাগল যে, কী বলব! মেয়েটিকে অমনভাবে বিনা কারণে ব্যথা দিয়ে এলাম— একটি কুৎসিত, নোংরা, একরোখা শুয়োরের মতো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। নয়নাকে আমি অন্যায়ভাবে ব্যথা দিয়ে এলাম। ভারী খারাপ আমি; ভীষণ খারাপ।

দমদম এয়ারপোর্টের রিসেপশন কাউন্টারের পাশের টেলিফোন-বুথ থেকে ফোন করছিলাম। ডায়াল টোন শুনতে পেলাম— ঘটাং করে পয়সা ফেললাম।

একবার পিছন ফিরে তাকালাম। ইনশিয়োরেন্স কাউন্টারের ভদ্রলোক তখনও আমার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছেন। হাতটা যদি ইচ্ছে মতো লম্বা হত তো ওইখানে দাঁড়িয়েই হাত বাড়িয়ে চটাস করে চড় মারতাম। মজা নাকি? পয়সা খরচ করে প্রিমিয়াম দেব আর উনি বলছেন ইনশিয়োরেন্স করবেন না। বলে কিনা, ইনশিয়োরেবল ইন্টারেস্ট নেই। যদি নয়নার জীবনে আমার ইন্টারেস্ট না থাকে— তো কার জীবনে আছে? তা ছাড়া পলিসি তো করছি আমি। প্লেন ক্র্যাশে মরলে নয়না দু'লাখ টাকা পাবে। ওকে তো নমিনি করলাম মাত্র।

ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে শুধোলেন, রিলেশন?

প্রথমে গম্ভীর হলাম।

তারপর ভাবলাম, গম্ভীর হয়ে থাকলে খারাপ কিছু ভাবতে পারে— কত রকম বদখত লোক আছে কলকাতা শহরে— তাদের কত শত মেয়ের সঙ্গে কত রকম সম্পর্ক আছে। পাছে এই রামগড়ুরের ছানা, নয়না সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবে— তাই হেসে ফেললাম। একেবারে এক গাল।

বললাম, ভালবাসি।

ভদ্রলোক চশমার তলা দিয়ে আমায় দরদরিয়ে দেখলেন, বললেন, তা হলে কী লিখব? লাভার?

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না না।

তারপর অসহায়ভাবে বললাম, কিছুই না লিখলে হয় না?

ভদ্রলোক পেনসিলটাকে দু'বার প্ল্যানচেটের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, ফিঁয়াসে?

খুশি হলাম।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আচ্ছা এইসব টেকনিকাল অসুবিধার জন্যে আমি মরে গেলে টাকাটা পেতে কোনও ঝামেলা হবে না তো?

উনি কনফিডেন্টলি বললেন, দেখবেনই তখন স্যার।

ফোন করতে করতে ভাবলাম, বেশ বলল বটে, দেখবেনই তখন স্যার। মরে গেলে কোথায় থাকব তা আমি কী করে জানব? দেখতে পাব কি না তাই বা কে জানে? আর দেখতে পেলেও অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবই যে এমন কি কোনও গ্যারান্টি আছে?

তবে মরে যাবার পর যাই হোক, মরবার আগের মুহূর্তটিতে তো অন্তত আরামে মরতে পারব। এই ভেবেই আশ্বস্ত হলাম। পাশের সিটের ব্যবসায়ী প্যাসেঞ্জার যখন কোমরে বাঁধা টাকার থলি নিয়ে হাঁউমাউ করে কাঁদবে— গর্বিতা এয়ার হোস্টেসের

যখন নাক দিয়ে খুকুমণির মতো জল গড়াবে, কন্ট্রোলে-বসা পাইলট আর কো-পাইলটের তলপেট যখন গুড়গুড়িয়ে উঠবে আষাঢ়ে মেঘের মতো— তখন একা আমি আরাম করে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখব। দু'লাখ টাকায় নয়না অনেক কিছু করতে পারবে। একটি ছোট্ট লনওয়ালা বাড়ি। একটি আকাশি-নীল রঙা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। তারপর ও যাকে ভালবাসবে, তার জন্যে কিছু করতে পারবে। সেই ছেলে যদি পড়াশুনা করতে ভালবাসে, তাকে একটি মনোমতো স্টাডি করে দিতে পারবে। সে যদি শিকার করতে ভালবাসে, তাকে দামি দামি ডাবল-ব্যারেল রাইফেল কিনে দিতে পারবে— আরও অনেক কিছু করতে পারবে— যা নয়না করতে চায় এবং যা ও আমায় কোনওদিনও জানতে দেয়নি।

অত সামান্য প্রিমিয়ামের বদলে এমন একটি তৃপ্তি যে পাওয়া যাবে তা ভেবেই ভাল লাগছে।

ফোনটা বাজছে। প্রায় দু'মিনিট হল। এত সকালে বোধহয় কেউ ওঠেনি।

বেয়ারা ধরল। বলল, নয়না উঠেছে। চা খাচ্ছে।

নয়না এসে ফোন ধরল।

কী ব্যাপার? এত সকালে?

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করছি।

কোথায় গেছিলেন?

কোথাও যাইনি। এখন যাচ্ছি। গৌহাটি। সেখান থেকে শিলং।

বেড়াতে?

না না। অফিসের কাজে।

আগেই যখন বলেননি, তখন তো পৌঁছেই খবরটা দিতে পারতেন।

রাগ কোরো না। বিশ্বাস করো। গতকাল দিনে ও রাতে তোমায় তিনবার ফোন করেছিলাম।

আমি তো সবসময়ই বাড়ি ছিলাম।

হয়তো ছিলে। কিন্তু তুমি একবারও ফোন ধরোনি।

কে ধরেছিল?

প্রথম দু'বার তোমার জামাইবাবু, মানে দিলীপদা ধরেছিলেন, তার পরের বার ময়নাদি। আমি যখন কথা বললাম না তখন দিদি বললেন Ghost call.

নয়না রেগে গেল। বলল, কেন? আপনি কী করেছিলেন?

আমি কিছুই করিনি বা বলিনি। মানে বলতে পারিনি। আসলে আমার লজ্জা করছিল ভীষণ।

লজ্জা করছিল? কেন?

মানে ভেবেছিলাম, কিছু মনে করতে পারেন ওঁরা। কী কারণে আমি তোমাকে রোজ রোজ ফোন করি— একথা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

কেন ফোন করেন আপনি জানেন না?

আমি জানি। আমি তো জানিই। আমার জন্যে ভয় নয়। ভয় তোমার জন্যে। তোমাকে পাছে ওঁরা কিছু ভাবেন। অথচ ভাবার কিছুই নেই।

আমি কাউকে কেয়ার করি না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা, আপনি না বাঘ মারেন?

বললাম, সে সাহস অন্য সাহস। সে অনেক সহজ সাহস। তুমি বুঝবে না। কীসের ভয়, তা তুমি বুঝবে না।

ও চুপ করে রইল।

বললাম, শোনো। এক্ষুনি একটি দু'লাখ টাকার পলিসি করেছি। রসিদটা খামে করে তোমাকে পাঠালাম। আমার যদি কিছু হয় টাকাটা তোমার খুশিমতো খরচ কোরো। তোমাকে তো কিছুই দিতে পারিনি।

ব্যাপারটার অভিনবত্বে ও বোধহয় রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ কিছু বলল না।

তারপর বলল, প্লেনে চড়লেই সকলে মরছে কিনা!

বললাম, একদিন না একদিন তো মরতে পারে। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তারপর, ওর কাছে প্রতি বার বাইরে যাবার আগে যেমন করে ভিক্ষা চাই, তেমনি করে ভিক্ষা চাইলাম।

আমাকে চিঠি লিখবে? অন্তত একটি চিঠি।

চিঠি? আচ্ছা। একটা তো? আচ্ছা। একটা লিখব। উঠবেন কোথায়?

পাইনউড হোটেলে উঠব। খুব চমৎকার হোটেল। তুমি গেছ শিলং?

অনেকদিন আগে। ছোটবেলায়। আমরা পিক হোটেলে ছিলাম।

বললাম, ইস, যদি আমরা দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারতাম? খুব মজা হত, না?

হয়তো মজা হত। কিন্তু কিছু কিছু মজা থাকে যা বাস্তবে হয় না। যা কল্পনায় করতে হয়।

বললাম, জানি তা।

কিছুক্ষণ পরে ও বলল, ঋজুদা, আপনি একটা পাগল। সত্যি সত্যিই ইনশিয়োরেন্স করেছেন? কেন করেছেন? আমি আপনার কে?

বললাম, তুমি আমার কেউ নও। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর হয়তো কেউ হবে।

ও অস্বস্তিভরা গলায় বলল, আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলেই পড়লাম আমি। শুনুন। খুব ভাল হয়ে থাকবেন কিন্তু। দুষ্টুমি করবেন না। রোজ আমাকে একটা করে চিঠি দেবেন।

নয়নার গলাটা একটু ভারী ভারী লাগল।

আমি নিশ্চয়ই দেব। তুমি দেবে তো? তোমার চিঠির জন্যে বসে থাকব কিন্তু। তোমার যা খুশি লিখো; কিন্তু লিখো।

একটা চিঠি তো? বেশ! এবারে ঠিক দেব। দেখবেন। তারপর বলল, ভাল লাগে

না। কী যে চলে যান-না, না বলে-কয়ে এমনি হুট করে। ভেবেছিলাম, এই রবিবারে আপনাকে খেতে বলব। মা অনেকদিন হল আমায় বলছেন।

কী করব বলো? অফিসের কাজ। না গিয়ে উপায় নেই।

শিলঙে তো এখন বেশ ঠান্ডা হবে। ভাল করে গরম কাপড় জামা নিয়েছেন তো? ঠান্ডা লাগাবেন না কিন্তু।

এমন সময় প্লেন ছাড়ার অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম মাইক্রোফোনে।

বললাম, নয়না, ছাড়ছি এখন। প্লেনে উঠতে হবে। চলি।

ওপাশ থেকে নয়না তাড়াতাড়ি বলল, ঋজুদা, ভাল হয়ে থাকবেন। চিঠি দেবেন।

আচ্ছা!

ফোন ছেড়ে দিয়ে প্লেনটি যেখানে টেক-অফের জন্যে রানি মৌমাছির মতো উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে দৌড়োলাম।

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে একজন মোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। ভদ্রলোক মারেন আর কী। যেন আমারই দোষ।

কিন্তু আমার এখন কারও সঙ্গেই ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই।

হাত জোড় করে থিয়েটারি ভঙ্গিতে বললাম, অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন। আবার দৌড়োলাম। আমার পায়ে এখন খুরাল হরিণের বেগ। আমি এখন প্লেনের চেয়েও জোরে ছুটতে পারি। আমি নাচতে নাচতে দৌড়োলাম। আমি ভাল হয়ে থাকব, আমি ভাল হয়ে থাকব, আমি ভাল হয়ে থাকব...।

প্লেনে উঠে গেলাম। সিঁড়ির মুখে, পাকা এয়ার-হোস্টেস বিজ্ঞের মতো বলল, গুড মর্নিং। আমি হাসলাম, বললাম, 'ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড।' মেয়েটি একটু ঘাবড়ে গেল। জায়গায় গিয়ে বসলাম। পাশে এক ছোকরা মিলিটারি অফিসার। আমাদের বয়সিই হবে। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। তাকে পাশ কাটিয়ে জানালার পাশে আমার সিটে বসলাম।

ফকার-ফ্রেন্ডশিপ বা অন্য কোনও প্রেশারইজড প্লেনে চড়ার মানে হয় না কোনও। বাইরের শব্দ-টব্দ কিছুই কানে আসে না। সাইলেন্ট পিকচারের মতো শুধু দেখা যায়। এর চেয়ে পুরনো ভাঙা ড্যাকোটা ভাল। পয়সা দিয়ে যে প্লেনে চড়েছি, তা প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারা যায়। ধড়ফড়-গড়গড় করে। ক্ষণে ক্ষণে এয়ার-পকেটে পড়ে বডি-থ্রো দেয়। ডিগবাজি খেতে চায়। মানে, প্রাণ এবং কান নিয়ে প্রতিমুহূর্তে লোফালুফি করে। বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস এক্সপিরিয়েন্স। তা নয়, এ যেন এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে বসে থাকা।

প্লেনটা ট্যাক্সিয়িং করছে— উড়ল— উড়ল— ব্যস। এবার সোঁ সোঁ করে মেঘ ফুঁড়ে উপরে উঠল— মেঘকে নীচে ফেলে আরও উঠে গেল। তারপর মুখ সোজা করে গন্তব্যের দিকে চলল।

পাকিস্তান আমাদের সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হয়তো, কিন্তু আমাদের মতো প্লেন যাত্রীর লাভ হয়েছে বিস্তর। আগে প্লেন গৌহাটি যেত

পাকিস্তানের উপর দিয়ে। এয়ার-হোস্টেস ক্যানক্যানে গলায় বলত, উই উইল শর্টলি ফ্লাই ওভার দি রিভার পদমা।

জানালা দিয়ে পদ্মার ছবি দেখতাম— চর, জল; অববাহিকা। গল্পে-শোনা ভাটিয়ালি গানের পদ্মা, কল্পনার রাজকন্যা পদ্মা।

কিন্তু এ বছর পাকিস্তানের উপর দিয়ে যাওয়া চলবে না।

গেলেই হয়তো কড়াক-পিঙ করে দেবে।

এখন প্রায় হিমালয়ের কোল ঘেঁষে যেতে হয়। ভারতের মধ্যে মধ্যে। আর ভাগ্যিস যেতে হয়। তুষারমৌলি হিমালয়ের সে কী রূপ। বরফাবৃত চূড়ায় সকালের রোদ এসে পড়েছে— আজ যেন নগাধিরাজের অভিষেক হচ্ছে। দার্জিলিং-আলমোড়া থেকেও হিমালয় দেখা, আর এ একেবারে নগাধিরাজের মুখের কাছে গিয়ে দেখা। এ দেখার তুলনা হয় না। কী সোনালি সুখ। কী সুন্দর। আমার নয়নাসোনার চেয়েও সুন্দর। এ দৃশ্য না-দেখলে জীবনে সত্যিই একটা দেখার মতো কিছু অদেখাই রয়ে যেত।

এয়ার-হোস্টেস ব্রেকফাস্টের ট্রে-টা নামিয়ে দিয়ে গেল। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে শুধোল, চা না কফি? বললুম, কফি। সামনে বসা গুজরাটি ভদ্রলোককে মেয়েটি শুধোল, ভেজেটারিয়ান অর নন-ভেজেটারিয়ান?

ভদ্রলোক সাবধানে এদিক-ওদিকে তাকালেন, তারপর প্রাইভেটলি শুধোলেন, হুইচ উইল বি বেটার?

তার মানে, বুঝলাম ডিম মাংস খাবার ইচ্ছে হয়েছে।

বেচারি মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ওর এয়ার-হোস্টেসের জীবনে এমন তাজ্জব প্রশ্ন ও শোনেনি।

আমার চোখে চোখ পড়তেই ইশারায় বললাম, নন-ভেজ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি পেশাদারি হাসি হেসে বলল, নন-ভেজেটারিয়ান।

ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, দেন, নন-ভেজেটারিয়ান প্লিজ।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে জমিয়ে পাইপটা ধরালাম। এখন খুব ভাল লাগছে। প্লেনে উঠেই প্রথম মিনিট পনেরো-কুড়ি কেমন যেন অস্বস্তি লাগে । মাটি ছেড়ে, সাধের পৃথিবী ছেড়ে মনটা দুখায়।

এখন বেশ ভাল লাগছে। প্রপেলার দুটো নীল আকাশে হাওয়া কাটছে। পুজোর আর বেশি দেরি নেই। ধবধবে সাদা মেঘে সোনালি রোদ লেগেছে। পায়ের তলায় সুন্দরী পৃথিবী লুটিয়ে রয়েছে। ধুলো নেই, বালি নেই, স্টেটবাসের ধোঁয়া নেই, ধ্বংস করো ধ্বংস করো, চলবে না চলবে না, চিৎকার নেই। এখানে সবকিছু চলবে। গান গাওয়া চলবে, কাউকে ভীষণভাবে ভালবাসা চলবে, মানে, এখানে জীবন ছাড়িয়ে এসেও বেঁচে থাকা চলবে।

প্রপেলার দুটো ঘুরছে। নিশ্চয়ই গুনগুন করছে। ভিতরে বসে শোনা যাচ্ছে না। প্লেনের স্টার-বোর্ড উইংয়ের একটা পাশে ছায়া পড়েছে। সাদা বরফের মতো কুচি

কুচি জল জমেছে ধূসর পাখাটার গায়ে। যেন কোনও করুণ জাঙ্গিল— উড়ে চলেছে— উড়ে চলেছে— উড়ে চলেছে। ভারী ভাল লাগছে। বেঁচে আছি বলে আনন্দ হচ্ছে। মরার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। পৃথিবীটা এত সুন্দর জায়গা। এত কিছু কান ভরে শোনার আছে, চোখ ভরে দেখার আছে, আর এই একটি পাগল মন নিয়ে ভাবার আছে যে, আমার মরতে ইচ্ছে করে না।

আমি খুব ভাল আছি; ভাল হয়ে থাকব।

৮

এসবে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই উত্তাপহীনতা, এই ব্যথা পাওয়া, এই নিজেকে ছোট করার সীমালঙ্ঘন— এই সবকিছুতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি একটুও ভাল নেই।

আমার মনে পড়ে না, নয়না কোন ব্যাপারে আমার অনুরোধ রেখেছে। আমাকে কোন অবকাশে অপমান না করেছে! আমার কোন আশাকে সে সফল করেছে?

শিলং থেকে রোজ রাতে নয়নাকে আমি একটি করে চিঠি দিয়েছি। সকাল থেকে রাতে কী করলাম লিখেছি—। রোজ শোবার সময় পার্স থেকে ওর ছোট্ট ফোটোটি বের করে শুয়ে শুয়ে দেখেছি। ওর ছবির দিকে চাইলে মনে হয় না ও এরকম নিষ্ঠুর হতে পারে, এমন বিবেকহীন হতে পারে। রোজ শোবার সময়, আমি ওর জন্যে শুভকামনা করে ঘুমিয়েছি। কাজের অবকাশে, পাখি-ডাকা দুপুরে, ঝাউবনে-দোলা-দেওয়া হাওয়ায় যখন রোদের বাঁকা ফালি এসে পড়েছে— পাইনউড হোটেলের কাঠের ফ্লোরের বিরাট ডাইনিং রুমের পরদা-দেওয়া জানালার পাশে বসে, আমি একা একা লাঞ্চ খেয়েছি— আর নয়নার কথা ভেবেছি।

আমার সজ্ঞানে, আমার চোখ খুলে, নয়না যা পছন্দ করে না তেমন কোনও কিছুই যে আমি করতে পারি এমন ভাবনাগুলিকে পর্যন্ত আমি ট্রাউজারের চোরকাঁটার মতো একটি একটি করে উপড়ে ফেলেছি।

প্রতিদিন দুপুরে ও রাতে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে খোঁজ করেছি আমার চিঠি এসেছে কি না। তার সঙ্গে বসে ডাকবিভাগের নিরীহ কর্মচারীদের গাফিলতির তীব্র নিন্দা করেছি। ভেবেছি, চিঠি না-পাওয়ার জন্য তারাই দায়ী।

হয়তো কিছুই লিখত না নয়না চিঠিতে। হয়তো লিখত, 'সু'দার, টেবলটেনিস টুর্নামেন্ট আরম্ভ হয়েছে— ওদের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার (জিম) শরীর ভাল যাচ্ছে না। ওর পড়াশুনার চাপ চলেছে। ইত্যাদি।

ও যে কোনওদিন চিঠিতে আমাকে এমন কিছু লিখবে যা পরে ওর বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা আমি মনে করি না। তা ছাড়া কোনও ব্যাপারে, বিশেষ করে ওর লেখা চিঠি দেখিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করে ঠকানোর কথা, আমি অন্তত মনেও আনতে পারি না। তা ছাড়া ব্ল্যাকমেল যদি কেউ কোনওদিন আমাকে করতে চায়, তা ও-ই

করতে পারবে। কারণ, আমি ওকে কিছু বাকি রেখে চিঠি লিখিনি। একজন সদ্‌বংশজাত ছেলে একজন সদ্‌বংশজাতা মেয়েকে কিছুই-বাকি-না-রেখে ভালবাসলে যেমন করে চিঠি লিখতে পারে তেমন করেই লিখেছি। এ চিঠিগুলির জন্যে হয়তো ভবিষ্যতে অনেক নিগৃহীত হতে হবে আমাকে। অনেকে এবং হয়তো নয়নাও গায়ে থুথু দেবে। আমার কী হবে তা নিয়ে কখনও আমি ভাবিনি। কারণ আমার ভালবাসায় কোনও মেকি ছিল না— আজও নেই। ও যদি আমার উজাড়-করা ভালবাসার প্রতিদানে আমায় আরও শাস্তি দিতে চায় তা দেবে। আমার অধিকার বোধহয় শাস্তিতেই— পুরস্কারের ভাগ্য করে তো এ জন্মে জন্মাইনি।

কিন্তু আমি তো ওর কাছে প্রেমপত্র প্রত্যাশা করিনি। শুধু ও কথা দিয়েছিল যে, একটা চিঠি দেবে। পাঁচটা নয়, দশটা নয়; মাত্র একটা চিঠি। সেই প্রতিশ্রুত একটি মাত্র চিঠিও আমাকে দেয়নি। আসলে আমিও যে একটা মানুষ, একটা রক্ত-মাংস— শরীর-হৃদয়ের মানুষ তো বোধহয় নয়না কোনওদিন ভেবে দেখেনি।

আমি কি ব্যর্থ প্রেমিক? হয়তো ব্যর্থ আমি। ব্যর্থ; কারণ আমি নিজেকে সার্থক করতে পারিনি। কিন্তু তা বলে প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। কারও প্রেমই কোনওদিন ব্যর্থ হয়নি। আমি সব সময় বুঝি, ভাবি, মনে রাখি যে, আমি একটি সামান্য ছেলে— একটি সামান্য ইঞ্জিনিয়র ঋজু বোস। আমার গর্ব করার মতো জীবনে কীই বা ছিল। না চেহারা, না গুণ; না অন্য কিছু। আমার মতো অনেক অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে কলকাতার পথেঘাটে আকছার ঘুরে বেড়ায়। আসলে আমার সর্বস্ব দিয়ে নয়নাকে ভালবাসার আগে আমার কোনও পরিচয়ই ছিল না। আমি একটি Negative entity ছিলাম। কিন্তু এখন আমি একজন মহৎ মানুষ। প্রেম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে যা আমার কোনওদিন ছিল না; যা কোনওদিন আমি অন্যত্র পেতাম না।

নয়না আমাকে কিছুই দেয়নি এতবড় মিথ্যা কথা বললে আমার পাপ হবে। নয়না আমাকে যা দিয়েছে তার ঋণ শোধ করতেই আমার আবার এ পৃথিবীতে আসতে হবে। কিংবা হয়তো গত জন্মেও কিছু ঋণ ছিল। সে বোঝাই এখন হালকা করছি। কিন্তু এও তো সত্যি, নিজের কিছুমাত্রই না হারিয়ে নয়না আমাকে যা দিতে পারত তার কিছুই ও দেয়নি। নয়না সে কথা আমার চেয়েও ভাল করে জানে। তবু, ওর যদি বুদ্ধি বলে কিছু থেকে থাকে, যদি মন বলে কোনও পরিশীলিত বস্তু থেকে থাকে, তবে একদিন ও বুঝবে যে, যার বুকেই শুয়ে থাকুক না কেন, ঋজু বোসের মতো করে আর কেউ এ জন্মে ওকে ভালবাসতে পারবে না; পারেনি। একদিন না একদিন, এ সত্য তার কাছে প্রতিভাত হবেই।

ভুলে থাকার চেষ্টা করি। সবসময় চেষ্টা করি। কিন্তু ভারী দেখতে ইচ্ছে করে ওকে, বড় কথা বলতে ইচ্ছে করে। মনটা পাগল পাগল করে। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব শাসন করি. বলি, কলকাতা শহরে নয়নাপেঁচি ছাড়া আর কি মেয়ে নেই? তোমাকে কি আর কেউ ভালবাসতে চায় না? চায়নি কোনওদিন? তক্ষুনি যে-আমি মনকে শাসন করে, সে-আমিকে ভীষণ ধমকে দিয়ে অন্য-আমি বলে,

ইডিয়টের মতো কথা বোলো না। নয়না নয়নাই। নয়নার অভাব অন্য কাউকে দিয়ে পূরণ হয় না।

আসলে এই ছুটির দিনগুলোই জ্বালায়। যেই নিমগাছটায় ঝুরু ঝুরু হাওয়া দেয়, স্থলপদ্ম গাছের সারিতে রোদের আঁচ লাগে— রঙ্গনেদের ডালে মৌটুসি পাখি এসে কিস্‌কিস্ করে কথা বলে, অমনি ভিতরের পাগলটা গরাদ ভেঙে বাইরে আসতে চায়।

আমাকে চিঠি না লিখে ও যা অন্যায় করেছে তার কোনও ক্ষমা হয় না। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওকে ভুলে যাব। অন্তত এক মাস ওর সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখব না। মানে, ভেবেছিলাম, ওকে একটু টাইট দিতে হবে।

কিন্তু শিলং থেকে ফিরেছি মাত্র পাঁচ দিন। ফিরে আসার পর এই প্রথম ছুটির দিন। কিন্তু আর প্রতিজ্ঞা রাখা হয়ে উঠল না। ভাবলাম একটা টেলিফোন করিই না নয়নাকে। এবারের মতো ক্ষমা করে দিই। যেতেও পারতাম ওদের ওখানে। কিন্তু একা একা কথা বলতে পাই না। সুজয়টা খেলার আলোচনা করবে। কোন প্লেয়ার কোন টিমে গেল— এই সিজনে কে ক'টা গোল দিল—। এখনও সেই কলেজের ছেলেই রয়ে গেছে— মাসিমা তাঁর ন'দেওরের সেজ ছেলে দুর্গাপুরে কী ভাবে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল তার গল্প করবেন। নয়নার মুখের দিকে ভাল করে একবার তাকাতে পর্যন্ত পারব না। ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনতে হবে, মাথা নাড়তে হবে— তারপর চা কি কফি খেয়ে রাগে গরগর করতে করতে চলে আসতে হবে। তার চেয়ে ফোন করা ভাল।

ফোনটা নয়না ধরল। ইস কী বরাত আজ।

কে?

আমি নয়না বলছি। কে? ঋজুদা?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বা রে। তা হলে ফোন করা কেন? ছেড়ে দিই? (বলে হাসল)।

রাগে গা জ্বালা করতে লাগল।

ও আবার বলল, কেন? কথা বলবেন না কেন?

কেন, তুমি জানো না?

না! কী হয়েছে? কবে এলেন আপনি?

তা দিয়ে কী হবে!

আপনার সব ক'টি চিঠি পেয়েছি। প্রতিটি চিঠি দারুণ হয়েছে। ভীষণ— ভীষণ ভাল লেগেছে। মানে, এত ভাল লেগেছে যা দাদা এবং মাকেও দেখিয়েছি।

কী করেছ?

চিঠিগুলি দাদা এবং মাকে দেখিয়েছি।

তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার চিঠি কাউকে দেখাবে না?

করেছিলাম। কিন্তু এই চিঠিগুলো দারুণ ভাল হয়েছিল। এদের বেলা ও সব প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা খাটে না। সুমিতাকেও দেখিয়েছি।

কিছু বলার নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

কী হল? কথা বলুন।

তুমি আমাকে চিঠি দাওনি কেন?

ও খুব ক্যাজুয়ালি বলল, আর বলবেন না। জানেন, একদিন মনেও পড়ল। কিন্তু খাম-টাম ছিল না—। লিখব লিখব করে, আর হয়ে উঠল না। আর কীই বা লিখতাম? লিখিনি ভালই হয়েছে। পড়ে, আপনি হয়তো হাসতেন।

কী আর বলব? সত্যিই বলার কিছুই নেই। চুপ করে রইলাম।

নয়না বলল, তারপর? খুব তো বেড়িয়ে এলেন।

হ্যাঁ, বেড়াতেই তো গেছিলাম কিনা? শিলঙে উঠতে যা বমি হয়। ভদ্রলোক শিলঙে যায়?

বমি হয়? সে কী? আপনি কি মেয়ে নাকি?

ভীষণ রাগ হল। বললাম, মানে? মেয়ে নাকি মানে কী? ট্রাক ট্রাক ষণ্ডা গুন্ডা মিলিটারির জোয়ানগুলি গলগল গলগল করে সারারাস্তা বমি করতে করতে যায় যে— তারাও বুঝি মেয়ে?

নয়না হাসতে হাসতে বলল, তা জানি না, কিন্তু খুব হাসি পাচ্ছে। আপনি দোলনা দুলতে পারেন?

দোলনায় আবার ছেলেরা চড়ে নাকি?

পারেন?

না। আমার গা গোলায়।

ছিঃ। লোককে বলবেন না। সকলে হাসবে।

একটু থেমেই বলল থাক, বাজে কথা থাক। এই একটু আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম।

আমার কী সৌভাগ্য!

সত্যি। আপনার বন্দুকটা নিয়ে একবার আমাদের বাড়ি আসবেন?

কেন? পাগল কুকুর বেরিয়েছে নাকি?

না। পাগল কুকুর নয়। টিকটিকি— মানে মোটা মোটা বিচ্ছিরি কুমিরের মতো গা'টা— কালো দেখতে।

কোথায়?

আমার বাথরুমে। দেওয়ালে। এমন ভয় দেখিয়েছে না আজ সকালে! সকালে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে যেই মুখ তুলেছি, দেখি আয়নার নীচে থেকে একেবারে আমার নাকের সামনে উঁকি মারছে। চমকে উঠে এমন চিৎকার করেছি যে মা দৌড়ে এসেছেন। পার্টিকুলারলি এই একটা টিকটিকিই খারাপ। যেমন দেখতে, তেমন স্বভাব।

বললাম, আমার মতো?

ও সিরিয়াসলি বলল, না না, ঠাট্টা নয়। এমন গোল্লা গোল্লা চোখে তাকায় না! চান করার সময়ও ভয় দেখায়। অন্য সাদা টিকটিকিগুলো কিছু করে না; ভাল। বেশ মেয়েলি স্বভাবের। এইটা একটা জংলি। পুরুষ পুরুষ।

তারপর একটু থেমে বলল, আসবেন বন্দুকটা নিয়ে?

টিকটিকি মারতে বন্দুক লাগে না। এয়ার রাইফেলেই কাজ হবে। কিংবা, গিয়ে, হাতে ধরে পকেটে পুরেও নিয়ে আসতে পারি।

ইস, ঘেন্না করবে না?

ঘেন্না করবে কেন? এমন একজন ভাগ্যবান ভদ্রলোক।

কেন? কেন? ভাগ্যবান কেন?

তা জানি না। তবে আমার খুব ইচ্ছে করে, আমি তোমার চান-ঘরের টিকটিকি হই।

কেন?

পরক্ষণেই মানে বুঝতে পেরে বলল, ই—স, কী খারাপ আপনি। ভারী, ভারী খারাপ হয়েছেন। সত্যি সত্যিই আপনি টিকটিকিটার মতোই জংলি। ছিঃ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

ও সামনে থাকলে, সর্বাঙ্গীণ লজ্জায় লাল হলে ওকে কেমন দেখায় দেখতে পেতাম।

তুমি কেমন আছ?

ভাল। খুব ভাল। আপনি কেমন আছেন?

ভাল।

শিলঙে ভাল হয়ে ছিলেন তো?

কেন? তুমি বললেই কি ভাল হয়ে থাকতে হবে?

বা রে! আমি তো তা বলিনি।

তোমার কথা আমি কেন শুনব? তুমি আমার কোনও কথা শোনো?

এবারের মতো ক্ষমা করুন। দেখবেন, আমি আপনার সব কথা শুনব।

৯

পাড়াটা থমথম করছে। ভয়ে নয়, নিস্তরঙ্গতায়। মিষ্টি মিষ্টি রোদে পাশের বাড়ির বউ চান করে, খড়কে-ডুরে শাড়ি পরে, দোতলার বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন দেখছে। কর্তা অফিস থেকে ফিরবেন, সে অপেক্ষায় নিশ্চয়ই অপেক্ষমাণ। আজ শনিবার। নিশ্চয়ই দুপুরে বাড়ি ফিরে লাঞ্চ করবেন। ভাল ভাল পদ রান্না হয়েছে। আজকে কর্তা রেলিশ করে কিছু খাবেন। তারপর হয়তো কর্তা-গিন্নি সিনেমায় যাবেন। বড় সাহেব হলে টার্ফ ক্লাবে, কি গলফ ক্লাবেও যেতে পারেন। নইলে অনেক কিছু করবেন, ভাবনীয় বা অভাবনীয়।

এমন সময় নয়না ঘরে ঢুকে বলল, আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছেন?

হাতে-ধরা ম্যাগাজিনটা ফেলে বললাম , শুধু আকাশে নয়।

নয়না কাছে এসে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, ওর নাম রানী। আমাদের রানীবউদি।

দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার স্বামী খুব শৌখিন?

শৌখিন? থার্ডক্লাস। শখ বলে কোনও জিনিস নেই। রানীবউদির রুচি কিন্তু খুব ভাল। তার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত যদি দিতে পারি— যেমন আপনার লেখা খুব ভালবাসেন।

কী ব্যাপার? আজ সকালে আমার কল্যাণে লেগেছ কেন?

কখনও কি অকল্যাণে লেগেছি?

না। তা লাগোনি। তুমি যে কল্যাণী।

ঠাট্টা নয়। একদিন বুঝতে পাবেন। কল্যাণী কি না।

নয়না চেয়ার টেনে বসে কী যেন ভাবতে লাগল।

রানীবউদি কিন্তু অনেকদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন। দাদাকেও অনেকদিন বলেছেন। আমার কাছে আপনার কথা প্রায়ই জিগ্যেস করেন। আপনি কখন লেখেন? কে আপনার কপি ফেয়ার করে দেয়? আপনার মেজাজ কেমন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তুমি কী বলো?

আমি আবার কী বলব? আমি কি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি যে এ সব কথার খবর রাখব? তবু, আমি বলি যা খুশি বানিয়ে বানিয়ে।

বললাম, বানিয়ে বানিয়ে মানে?

মানে, আমার যা বানাতে ইচ্ছে করে।

বললাম, তোমার তো বুদ্ধি রাখার জায়গা নেই— কিন্তু এও বলে দাওনি তো যে আমার লেখার অনুপ্রেরণা তুমিই।

ভারী তো লেখেন, তার আবার অনুপ্রেরণা।

আচ্ছা। তোমাকে নিয়েই যদি একটি গল্প লিখি।

আমাকে নিয়ে মানে?

তোমাকে নিয়ে মানে, তোমাকে নায়িকা করে!

আমি আবার নায়িকা হব কী করে? নায়িকা হবার যোগ্যতা কোথায়?

সে তো নায়ক এবং যে লিখবে সে বুঝবে।

তা হলে লিখুন। মনে হল, খুব নিস্পৃহ গলায় বলল কথাটা।

বললাম, তোমার গর্ব হবে না নয়না?

নয়না আমার চোখের দিকে চাইল— অনেকদিন পরে ও এরকমভাবে চাইল। তারপর মুখ নিচু করে নিয়ে বলল, হয়তো হবে। জানি না। কিন্তু নায়িকার গর্ব হলে লেখকের কী লাভ? লেখক কী পাবে?

বললাম, লেখকরা তো কিছু পাবার জন্যে লেখেন না। নিজেদের নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলার জন্যে লেখেন। লেখকরা কোনওদিনও লাভবান হন না। নায়ক-নায়িকারা খুশি হলেই তাঁরা খুশি হন।

নয়না বলল, আমি অত জানি না। তবে আমার ভাবতেই মজা লাগে। নায়িকাকে কিন্তু আমার চেয়ে সুন্দর করে আঁকবেন। আর যিনি ছবি আঁকবেন, তাঁকেও বলে দেবেন— নায়িকা যেন দারুণ দেখতে হয়।

বললাম, তোমার চেয়ে ভালয় আমার দরকার নেই। হুবহু তোমার মতো আঁকতে বলব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

নয়না বলল, সত্যি, সত্যি, সত্যি? আমাকে নিয়ে গল্প লিখবেন?

বললাম, সত্যি। সত্যি । সত্যি।

অনেকক্ষণ নয়না মুখ নিচু করে বসে কী যেন ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে ও চান করেছে। একটি খাটাউ ভয়েল পরেছে। চোখের নীচটা লালচে লাগছে। ভুরুতে একটু হালকা আইব্রো পেনসিল ছুঁইয়েছে। ঠোঁটে পাতলা করে ভেসলিন। চোখে সামান্য কাজল বুলিয়েছে। বারান্দার হাওয়ায়, ওর শিকাকাই-ঘষা চুল এলোমেলো হচ্ছে।

ভালবাসা কাকে বলে জানি না। কোনওদিন, জানতেও চাইনি। হয়তো কোনওদিন জানতে চাইও না। এই মুখটি, এই সুগন্ধি শরীরটিকে কাছে পেলে আমি আর কিছু চাইনি— কোনওদিন চাই না। বেঁচে থাকবার জন্যে আমি আর কিছুই চাই না।

বললাম, নেমন্তন্ন করেছ বলে কি মনে করেছ বাইরের রেস্তোরাঁগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে নাকি? খিদেয় যে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল। খেতে দেবে না?

নয়না হাসল।

ক্ষমা-চাওয়া হাসি। বলল, বেচা— রা। খুব খিদে পেয়েছে, না?

মায়ের মেয়ে তো এতক্ষণ নিজের কায়দা দেখিয়ে এল। এখন মা নিজে ছেলের বন্ধুর জন্যে বিশেষ পদ রান্না করছেন। আর একটু ধৈর্য ধরুন। বুড়ো মানুষ তো। মনে কষ্ট দিতে নেই! শখ করে রাঁধছেন।

বললাম, মেয়েকে শিক্ষা তো খুব চমৎকার দিয়েছেন মাসিমা। দেবদ্বিজে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিবে না। কিন্তু সে সঙ্গে এও তো শেখাতে পারতেন যে জীব মাত্রই প্রাণ আছে। এবং প্রাণ থাকিলেই আঘাত লাগিতে পারে। অতএব যুবার প্রাণে কষ্ট দিবে না।

নয়না এক ঝিলিক হেসে উঠল। বলল, আমি কোনও যুবার মনে সজ্ঞানে কষ্ট দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। এখন যদি কেউ কষ্ট পায়, মন-গড়া কষ্টে নিজেকে ভোগায়, তা হলে তাকে ভগবানও বাঁচাতে পারেন না।

মানুষ তো দূরের কথা, কী বলো?

ও চোখ দিয়ে সায় দিল।

মাসিমা বারান্দায় এলেন। বললেন, দেখেছ তোমার বন্ধুর কাণ্ড! এক্ষুনি ফোন করল যে ও আসতে পারবে না, ঋজুকে বলে দিতে, যেন কিছু মনে না করে।

ও গেছে কোথায়?

ওর এক বন্ধু রমেশ, তুমি চেনো না বোধহয়, আজ বিলেত চলে যাচ্ছে। বম্বে থেকে জাহাজ ধরবে। আজ বম্বে যাচ্ছে। তারই বাড়িতে গেছে।

না মাসিমা। আমি চিনি না।

সুজয়টার রকমই অমনি। বন্ধু এল বাড়িতে, তিনি গেলেন অন্য বন্ধুর বাড়ি।

নয়না বলল, তাতে কী হয়েছে, মা, ঋজুদা তো কিছু মনে করেনি।

মাসিমা বললেন, ঋজু মনে করুক আর না-করুক, ও আসবেই বা না কেন?

চলুন চলুন মাসিমা। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

চলো বাবা।

নয়নাদের খাবার ঘরটি আমার ভারী ভাল লাগে। এমনকী, বসবাস ঘরের চেয়েও ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কী, যে খাবার ঘরে ঢুকেই কেবল খিদে খিদে না পায়, বেশ শান্তির সঙ্গে নিরিবিলিতে খাওয়া না যায়, সেখানে খাওয়া-না-খাওয়া সমান।

ঘরটি ছোট। দুটি জানালা। জানালা দিয়ে ওদের লনটি চোখে পড়ে। চেরিগাছের পাতায় চারটি চড়াই চিড়বিড় করছে। হা-হা হাওয়া, বোগেনভিলিয়ার পাতায় হইহই করছে। ঘরের দেওয়ালে একটি স্টিল-লাইফ। তেলরঙা কাজ। এক কোণে ছোট্ট একটি রেফ্রিজারেটার ফিসফিস করে কী যেন কী বলে চলেছে। এক পাশে একটি মানানসই কাবার্ড। তাতে চিনে ক্রকারি। এক দেওয়ালে নয়নার একটি ফ্রক-পরা বেণি-ঝোলানো ফোটো। ছোটবেলায় নয়নার চেহারাটা এখনকার মতো ছিল না। কেমন যেন অন্য রকম ছিল। সাপের খোলস ছাড়ার মতো ও যেন পুরনো শরীর ছেড়ে হঠাৎ এই নতুন সুগন্ধি শরীরে প্রবেশ করেছে।

টেবিলে সুন্দর করে ফুল সাজিয়েছে নয়না। চমৎকার ম্যাটস পেতেছে। এরকম টেবিলে, এরকম ঘরে বসে, নুন-ভাত খেতেও ভাল লাগে। তাতেই পেট ভরে যায়। অনেক সময় কী খাচ্ছি সেটাই বড় হয় না, কেমন করে যাচ্ছি সেইটে বড় হয়। নয়নাদের খাবার ঘরে ঢুকলে কেবল আমার তাই মনে হয়।

সুজয়টার রুচি দিন দিন বিড়িওয়ালার মতো হচ্ছে। কলেজে ও অন্য রকম ছিল। অথচ নয়নার রুচি দিনে দিনে আরও সুন্দর হচ্ছে। ঠিক মনে মনে আমি যেমনটি চাই, যেমনটি কল্পনা করি। নয়না যেন আমার সবরকম চাওয়াকে সফল করবে বলেই এ-জন্মে জন্মেছিল।

মাসিমা চেয়ারটি টেনে দিয়ে বললেন , বোসো।

তারপর বললেন, নয়না ফ্রায়েড রাইস আর মুরগিটা নিজে রেঁধেছে। অন্য রান্না ঠাকুরের। আমি কেবল তোমার জন্যে নারকেল দিয়ে বুটের ডাল রেঁধেছি। নয়না বলছিল, তুমি ভালবাসো।

অবাক হলাম। আমি ভালবাসি? কই? আমি নিজেই জানি না। বললাম, নিজে জানি না আর নয়না জানল কী করে?

নয়নার মুখ লাল হয়ে গেল।

বলল, আপনি কী? সেই পিকনিকে কতখানি ভাত চেয়েছিলেন খালি ওই ডাল দিয়ে? মনে নেই? নিজে ভুলে যাবেন নিজের লোভের কথা, আর অন্যকে অপদস্থ করবেন।

মনে পড়ল, মনে পড়ল। ঠিক তো। আমি তো ভালবাসি। আমি যে ভালবাসি নিজেই কোনওদিন জানিনি। আমার লোভের কথা আমি ভুলে গেছি। এমনি করে আমার সমস্ত দুরন্ত লোভগুলির কথা যদি আমি ভুলে যেতে পারতাম!

মাসিমা বললেন, তোমরা দু'জনে খাও, আমি পুজোটা সেরে আসি ততক্ষণে। লজ্জা কোরো না ঋজু। তুমি আর সুজয় তো আমার কাছে আলাদা নও।

নয়না বলে উঠল, লজ্জা করার পাত্র কিনা উনি । দাদার দু'গুণ খান।

মাসিমা বকলেন, বললেন, এই! তুমি ভারী অসভ্য তো। বেশ করে। খায়। স্বাস্থ্যবান ছেলে, খাবে না তো কী? তোদের মতো ফিগার ফিগার বাতিক তো নেই?

নয়না বলল, বাতিক থেকেই বা কী লাভ হত? না খেলেই যেন রক-হাডসন হয়ে যেত।

নয়না আজ খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে সকাল থেকেই। কেন জানি না। এত কথা ওকে খুব কম বলতে শুনেছি।

মাসিমা চলে গেলেন।

আমি বললাম, চেহারাটা নিয়ে ঠাট্টা করো কেন? তুমি কি মনে করো তুমি খুব সুন্দরী? নিজে তো কাঁড়িয়া-পিরেতের মতো দেখতে!

তা তো আমি জানিই, তবু তো...।

কথা বললাম না। ফ্রায়েড রাইসটা জব্বর রেঁধেছে নয়না। একেবারে পিপিং কি ওয়ালডর্ফ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বললাম, রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে এনে নিজের বানানো বলে চালানো কি মহৎ কাজ? আমি সবই জানি।

জানেন তো সবই। তবে জেনেশুনে অন্য লোকের লেখা বেমালুম টুকে নিজের বলে চালিয়ে কয়েকটি সরলবুদ্ধি মেয়ের কাছে নাম কেনার আকাঙ্ক্ষাই বুঝি খুব মহৎ?

বললাম, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এই লেখা-টেখা নিয়ে কোনও কথা বোলো না। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলো কেন?

বেশ বলব না। কিন্তু আপনি কী রান্না বোঝেন? বলুন তো ফ্রায়েড রাইস কীসে রাঁধে? ঘি, সরষের তেল, না ডালডা?

খুব বোকা ভেবেছ? জানি না বুঝি? স্যালাড অয়েলে।

ও মাঃ। তা হলে জানেন? সরি।। সরি। আই উইথড্র। সত্যি। আপনি ক— ত্ব জানেন। বলেই হাসতে লাগল।

হেসো না বলছি।

ও বলল, বেশ হাসব না— খান খান— please ঝগড়া করবেন না। ভারী ঝগড়া করেন আপনি।

দু'জনে অনেকক্ষণ বসে আস্তে আস্তে খেলাম। খাওয়ার সময়ে যে-কোনও মেয়েকে দেখে বলা যায় সে সদ্‌বংশজাত কি না। কেউ কেউ রাক্ষসীর মতো গেলে। কেউ কেউ বাঘিনির মতো ভাতের থালায় থাবড়া মারে, আর কেউ বা পদ্মিনীর মতো স্বপ্নভরা আঙুলে আলতো করে খাবার তুলে মুখে দেয়। তাকে তখন দেখলে, সে যে আহারের মতো অমন একটি প্রাচীন, আদি ও পশুভিনরাণাং প্রক্রিয়া করছে, তা দেখে বোঝার উপায় থাকে না। যেমন করে আলপনা দেয় তেমনি করেই নয়না খায়। ও আমার চোখে আর্টের সংজ্ঞা। ওকে কখনও কোনও অবস্থায়, হঠাৎ ঘুম-ভেঙে, অথবা ভীষণ ক্লান্ত অবস্থাতেও কুৎসিত দেখায় না। ওর সৌন্দর্য আমার ভালবাসার মতো ওকে সবসময় জড়িয়ে থাকে।

খাওয়া শেষ হল।

মশলা-টশলা কিছু খাবেন?

না। পাইপ খাব।

চলুন। আমার ঘরে চলুন। দুপুরে মা'র কাছে মহিলা-সম্মিলনীর বন্ধুরা আসবেন। ও ঘরে থাকলে আপনার বিপদ আছে।

কেন? বিপদ কীসের?

বাঃ বাঃ। কী বলেন? এমন একজন এলিজিবল বাচেলার। মায়ের প্রত্যেক বন্ধুর গোটা তিনেক করে উজ্জ্বল কন্যারত্ন আছে। কাজেই বিপদ অনিবার্য।

আর তোমার মায়ের বুঝি কোনও কন্যা নেই?

আমার মায়ের মেয়ের ভার মাকে নিতে হবে না। সে নিজেই নিজের ভার বইতে পারে।

পারে বুঝি?

পারে না?

নয়নার ঘরটি দক্ষিণ-খোলা। একটি বিল্ট-ইন ওয়াড্রোব, একটি চওড়া ডিভান। কোনায় একটি পড়ার টেবল। একটি মোড়া। একফালি জাফরানি-রঙা মির্জাপুরি গালচে। তার উপরে একটি অ্যামপ্লিগ্রাম। দেওয়ালে, গোপাল ঘোষের একটি প্যাস্টেলে আঁকা স্কেচ।।

ডিভানে বসে পাইপটা ধরালাম।

নয়না বলল, আপনি একটু বসুন। আমি মায়ের খোঁজখবর নিয়ে আসি। বেচারি মা। মা'র জন্যে আমার ভারী কষ্ট হয়। একা একা মানুষ থাকতে পারে? আমার বন্ধুর মা'দের কত মজা। বাবাদের সঙ্গে সিনেমায় যান, চওড়া-চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি

পরেন। দোল-দুর্গোৎসবে কত আনন্দ করেন। আর মা আমার কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে থাকেন। বাবার উপর রাগ হয়। কোনও মানে হয়, এমন করে মাকে ফেলে যাবার?

বললাম, কী করবে বলো? আমার তোমার তো কোনও হাত নেই।

নয়না বলল, আমি এক্ষুনি আসছি, হ্যাঁ?

নয়না চলে গেল।

আমি বসে বসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ওইটুকু মেয়ের সকলের প্রতি কী সমবেদনা। ওর ওই ক্ষীণ শরীরের ভিতর যে এতবড় একটি বুদ্ধিমতী মহতী প্রাণ লুকিয়ে আছে তা ওকে যে কাছ থেকে না জানে, সে কখনও জানবে না।

ও ওর কাছের লোকেদের এমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যে সে বলার নয়। আমি জানি ও আমাকে ভালবাসে না। হয়তো কোনওদিন ভালবাসবেও না। অথচ ও কোনওদিন আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি যে, আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। একে ফ্লার্ট করা বলে না। একে কী বলে তা জানি না। তবে এটুকু জানি, খুব কম মেয়ে জানে যে, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের চাওয়াকে অবিকৃত রেখেও নিজেকে অনিঃশেষে কোনও ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিতে হয়।

হাই-ভোল্টেজ তামার তারের মতো, নয়না অনেক বিদ্যুৎভার সইতে পারে, বইতে পারে; কিন্তু ও নিজে জ্বলে যায় না। ও সেই বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে গিয়ে মনে মনে ঘরে ঘরে আলো জ্বালায়। ও আমার মন-দেয়ালি।

নোংরা ভিক্ষুকের নোংরা হাতে ওর শালীনতা কলুষিত হতে পারে যে, সে সম্ভাবনার কথা ও জানে। অথচ, তবু যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো, ও আমার কামনাহত মনকে পবিত্রতার প্রদীপ জ্বেলে শুশ্রূষা করে, নিজের শরীরের গেরিলা বাহিনীকে ও অবহেলায় অগ্রাহ্য করে। কী করে ও পারে জানি না। শুধু জানি যে, ও পারে। একমাত্র ও-ই পারে।

একটু পরে নয়না ফিরে এল।

মোড়াটার উপর বসে বলল, Sound of Music দেখেছেন? গ্লোব-এ হচ্ছে।

বললাম, যখন কলেজে পড়তাম তখন আমাদের কলেজ হলে একবার হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম। অবশ্য অনেক দিন হয়ে গেল।

সে তো পুরনো ছবি। নতুন ছবি দেখেননি? সেভেন্টি মিলিমিটারের ছবি। আর কী গান; কী গান!

ব্যাপারটা কী বলো তো? ভাল করে মনে নেই।

ব্যাপারটা গান।

তারপর মোড়া ছেড়ে উঠে বলল, শুনুন তবে। আমার কাছে রেকর্ড আছে। শোনাচ্ছি।

লং-প্লেয়িং রেকর্ড— অনেক গান। তার মধ্যে একটি গান আমাকে ও বিশেষ করে শুনতে বলল। বিশেষ করে কানে লাগল—

Nothing comes from nothing,
Nothing ever could,
In my youth,
Or in my childhood:
I must have done
Something good...

গান শেষ হল।

শুধোলাম, আচ্ছা এই ছবিতে অনেকগুলো বাচ্চা-টাচ্চা ছিল না? জুলি এন্ড্রুজ আছে?

হ্যাঁ। আগে নান ছিল। পরে সাত-সাতটি ছেলেমেয়ের বাবা এক বদমেজাজি ক্যাপ্টেনের বাড়িতে গভর্নেস অ্যাপয়েন্টেড হল। পরে সেই ক্যাপ্টেনকে সে বিয়ে করল। মানে, "হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো; গান দিয়ে দ্বার খোলাব"।

বললাম, বলো কী? সাত-সাতটি ছেলেমেয়ের বাবাকে সুশ্রী কুমারী মেয়ে বিয়ে করল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

পুলকিত গলায় বললাম, তা হলে নিশ্চয় আমার মতো ব্যাচেলারদের আরও ভাল।

নয়না এক চিলতে হাসল। বলল, বলা যায় না। হয়তো ভালও হতে পারে—তবে only if they have done something good in their youth or in their childhood.

১০

পুজো পুজো পুজো। এসে গেল পুজো।

জানি, লাউড-স্পিকারের শব্দে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, লোকের ভিড়ে মাথা ধরবে। তবু, কেন জানি পুজো এলে ভাল লাগে।

বাঙালি বলে বোধহয়।

মনে-প্রাণে পুরোপুরি বাঙালি বলে বোধহয়।

শম্পু সরকার কি রুশি বিয়ান্দকারের তো এমন মনে হয় না। ওরা সাহেব। পুজোর ছুটিকেও ওরা অন্য যে কোনও ছুটি বলে মনে করে।

সকালে উঠে ওরা যথারীতি চান করবে, ব্রেকফাস্ট করবে, তারপর ড্রেইনপাইপ গলিয়ে কারও বাড়ি গিয়ে তাসের আড্ডায় বসবে, নয়তো ক্লাবে গিয়ে বিয়ার খাবে। চঞ্চল চন্দ হয়তো বারান্দায় পাজামা পরে বসে, নিউ স্টেটসম্যানের ফিনফিনে পাতা খুলে নিজেকে যথার্থ কালচারড মনে করবে। যেন, পুজো তো কী? যেন পুজো কিছুই নয়।

আমি তা ভাবতে পারি না। মহালয়ার ভোরে, আধো-ঘুমে-আধো-জাগরণে বালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে শুয়ে যখন মহিষাসুর বধের বর্ণনা শুনব রেডিয়োতে, যখন সেই শেষরাতে, সমস্ত পাড়া সমস্ত কলকাতা শহর, সমস্ত বাংলাদেশ গমগম করবে এক শুদ্ধ বিমুগ্ধ প্রভাতী বন্দনায়, তখন যে কী ভাল লাগবে সে কী বলব! শুধু আমার কেন? খাঁটি বাঙালি মাত্রেরই লাগবে। পুজো আসছে। ভাল লাগবে না?

তারপর মহালয়ার ভোর হবে। শরতের নীল আকাশে রোদ্দুর ঝিলিক দেবে। সকালে হয়তো রেডিয়োতে কণিকা ব্যানার্জির গান থাকবে— শরত-আলোর কমল বনে, বাহির হয়ে বিহার করে, যে ছিল মোর মনে মনে...। শুনব। চুপ করে বসে কান পেতে শুনব; চোখ চেয়ে শরতের রোদ দেখব, নাক ভরে শিউলি ফুলের গন্ধ নেব; আর ভাল-লাগায় মরে যাব।

সেই পুজো এসে গেল।

অনেকদিন থেকে ভেবেছিলাম যে, নয়নাকে একটি ভাল শাড়ি কিনে দেব পুজোয়। পথ চলতে হঠাৎ কোনও শো-কেসে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি অনেকদিন। কোনও সুন্দর শাড়ি দেখেছি। মনে মনে নয়নাকে সে শাড়ি পরিয়ে, মনের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে কেমন দেখিয়েছে, ভেবে নিয়েছি। তারপর মনে হয়েছে, এ চলবে না। এ রং বড় ক্যাটকেটে। রং ভাল লেগেছে যদি-বা তো পাড় পছন্দ হয়নি। পাড় যদি বা পছন্দ হয়েছে তো আঁচলটা বড় জবরজং লেগেছে!

পথে পথে দোকানে দোকানে এ ক'দিন অবকাশ পেলেই ঘুরেছি, কিন্তু নয়নার শাড়ি পছন্দ হয়নি। নয়নাকে যে শাড়ি আমি দেব সে তো নিছক একটি শাড়ি মাত্র নয়। তা আমার ভালবাসার সুতো দিয়ে বোনা, তাতে যে আমার দুঃখের পাড়-বসানো— সে শাড়ির আঁচলার জরিতে যে আমার অনেক অবুঝ চাওয়া শরতের আলোয় জ্বলবে। সে শাড়ির সমস্ত মসৃণতায় আমি যে আমার নয়নাসোনার সমস্ত শরীরে মিশে থাকব— ছড়িয়ে থাকব। আমি যে জড়িয়ে থাকব।

অনেক বেছে বেছে শেষে পছন্দ হল একটি তসরের শাড়ি। শাড়ির মতো শাড়ি। আমার পুজোর ড্রয়িংস-এর বেশ একটি মোটা অঙ্কই তাতে চলে গেল।

ভাগ্যিস গেল।

নইলে ও টাকায় আমার কী হত? টাকায় কী হয়? কারই বা কী হয়? একটা সীমা— ন্যূনতম ভদ্রলোকি সীমায় পৌঁছোনোর পর টাকায় কারই বা কী হয়? ভালবাসার ধনকে উপহার দেবার মতো মহৎ উপায়ে নষ্ট করা ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থাকার মানে হয় না। আমি এ ব্যাপারে অনেক ভেবেছি। নিজের প্রয়োজন কোনওদিন মিটবে না। প্রয়োজনের শেষ হবে না। বাড়ালেই বাড়বে। তার চেয়ে নিজের প্রয়োজন সীমিত রেখে, যাদের ভালবাসি তাদের জন্যে কিছু করতে পারলে আনন্দে বুক ভরে যায়।

যে টাকায় নয়নাকে শাড়ি কিনে দিলাম, সে টাকায় আমার একটি ভাল টেরিলিনের সুট হত। কিন্তু বিনিময়ে এ যে আমার কত বড় পাওয়া হল আমিই

জানি। নয়না যেদিন পুজোর মধ্যে ওই শাড়িটি পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে, ওই শাড়িটি পরে যখন হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চাইবে, তখন আমি দশ-দশটি টেরিলিনের সুট-প্রাপ্তি আনন্দ পাব। সব আনন্দের মাপ কি একই কাঁটায় হয়? এ আনন্দ অন্য আনন্দ, উদার আনন্দ। মহৎ আনন্দ।

পুজোর দিনে পুজোমণ্ডপে ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, ভোগের খিচুড়ি রান্নার গন্ধ, ঢাকের শব্দ, শিশুর কান্নার শব্দ, যুবতীর উচ্ছল হাসির জলতরঙ্গ, এবং বিধবার করুণ বিষণ্ণ নিস্তব্ধতার মাঝে মা দুর্গার সামনে নয়না এই শাড়ি পরে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন আমি ভাল-লাগার পবিত্রতায় নিস্তরঙ্গ হয়ে যাব। তখন আমি নয়নাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চাইব। চান-করা খোলা চুল ওর পিঠময় ছড়িয়ে থাকবে। ওকে আমি নিচু হয়ে প্রণাম করব। ও বলবে, আঃ কী করছেন ঋজুদা! ওকে আমি প্রণাম করব, মা দুর্গাকে প্রণাম করব সেই পুজোর সকালকে প্রণাম করব, আমার সুগন্ধি ভালবাসাকে প্রণাম করব। কী করে হবে জানি না, সেই মুহূর্তে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নয়নাকে মায়েরই অন্য এক রূপ বলে আমার মনে হবে। সেই সকালে নয়নার কাছে আমি সস্তা কিছু চাইব না। শুধু মনের সুগন্ধ চাইব, শুধু নিচু হয়ে মাথা নত করে প্রণাম করতে চাইব। নিজেকে ছোট্ট করে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, ধুলো করে মায়ের সামনে নিজেকে জানার চেষ্টা করব।

আজ মহাষ্টমী। স্নান করে জাস্টিস মুখার্জির বাড়ির পুজোমণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এসেছি। এখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিজের ঘরে বসে আছি। ভাবছি, কী করা যায়। যতিদের বাড়ি পুজো হয়। দুপুরে যেতে বলেছে। খেতে বলেছে। পুজোর পরই ওরা ক'দিনের জন্যে হাজারিবাগে যাচ্ছে শিকারে। অনেকবার যেতে বলেছে আমায়। সুগতও যাচ্ছে। রঞ্জনও যাবে। ভাবছি, ঘুরেই আসি। অনেকদিন যাই না জঙ্গলে। ঘোড়ফরাসদের সঙ্গে কথা বলি না। টুঙি পাখির শিস শুনি না। কালি-তিতিরের ডাক শুনি না। মাদলের আওয়াজ শুনি না। মানে, অনেক কিছু অনেকদিন দেখি না, শুনি না; গন্ধ নিই না। অতএব যাব।

সুগতকে একটি ফোন করলাম। বললাম, যতির বাড়ি এসো। কথা আছে। আমিও হাজারিবাগ যাচ্ছি।

ও বলল, খুব ভাল কথা। এগারোটা নাগাদ চলে এসো। আমিও পৌঁছোচ্ছি।

ফোন রেখে দিলাম।

এমন সময় দরজার পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে কে যেন আমার ঘরের খোলা দরজায় দু'বার টোকা দিল।

চেয়ে দেখি, পরদার নীচে ফলসা-রঙা শাড়ির তলায় দুটি পা— খালি পা। এ পায়ের পাতা আমি চিনি। এ পায়ের পাতা অনেক রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি।

নয়না বলল, আসতে পারি?

উঠে বললাম, এসো এসো, আমার কী সৌভাগ্য!

ও ঘরে ঢুকল। একটু হাসল, তারপর আমার লেখার টেবলের সামনের চেয়ারে বসল।

বলল, মিনুদির সঙ্গে দেখা করে এলাম। উনি এক্ষুনি বেরুচ্ছেন। কাকিমাও দক্ষিণেশ্বরে গেছেন।

হুঁ। ভাগ্যিস গেছেন। নইলে কি রাধারানীর পা আমার ঘরে পড়ত?

পড়ত না?

না।

কী করে জানলেন?

জানি।

ও উত্তরে কিছু বলল না। আমার দিকে চেয়ে থাকল চুপ করে।

বললাম, নোড়ো না। চুপ করে বোসো। তোমাকে আশ মিটিয়ে দেখি। পরদাগুলো সরিয়ে দিই— ঘরটা আলোয় ভরে যাক। তোমার আলোয়।

ও, কথা না বলে, আমার পরদা সরানো দেখতে লাগল।

পরদা সরাতে আমাকে ওর কাছে যেতে হল। ওর গা দিয়ে নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে—। নতুন ব্লাউজ পরেছে— চুলের তেলের গন্ধ এবং নতুন শাড়ি-জামার গন্ধ মিলে ওকে কেমন নতুন নতুন লাগছে।

আবার এসে বসলাম মোড়াতে।

ও পা দুটি জোড়া করে সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে।

চুপ করে আমি ওর পায়ের পাতার দিকে চেয়ে রইলাম।

কী দেখছেন? অসভ্যের মতো?

তোমার পায়ের পাতা। আমায় একটু ধরতে দেবে?

ও উত্তেজিত হয়ে বলল, না। না। দেখতেও দেব না। বলেই শাড়ির পাড়ের আড়ালে পা ঢেকে নিল।

বললাম, তুমি এত কৃপণ কেন? পায়ের পাতা তো ভিখিরিকেও লোকে ধরতে দেয়। তুমি আমার সঙ্গে এমন করো কেন?

আপনি ভিখিনি নন বলে।

আমি তবে কী?

কী জানি না। তবে ভিখিরি নন।

নয়নার চোখে এমন একটি ভাব দেখলাম, যেন ও আমার এই পাগলামি দেখে কষ্ট পাচ্ছে। যেন ও আমাকে কিছুই যে দিতে পারল না, এই পুজোর দিনে, যে দিনে ভিখিরিরাও ভিক্ষে পায়, সে দিনে আমার এই সামান্য চাওয়াও ও পূরণ করল না— আমাকে এমন করে ফেরাল বলে, মনে হল, যেন ও দুঃখ পাচ্ছে।

আমি কিছু বললাম না। ওর অপমান এখন আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ও-ও আর কিছু বলল না। চুপ করে মুখ নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পর আমার টেবলে যে লেখাটি পড়ে ছিল সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বলল, এটা কী লিখছেন?

তোমাকে নিয়ে যে গল্প লিখব বলেছিলাম, মনে আছে? সেই গল্প লিখছি।

যে-কোনও অন্য মেয়ে হলে উল্লসিত হয়ে উঠত। কিন্তু আমি আমার নয়নাকে চিনি। ও কিছুই করল না। আমার দিকে একবার চাইল, যেন বলতে চাইল, এ আবার কী নতুন পাগলামি?

শুধোলাম, তোমার নিজের কী নাম হলে তুমি সবচেয়ে সুখী হতে? মানে, তোমাকে যদি তোমার নিজের নাম রাখতে বলা হত, তা হলে কী নাম রাখতে?

ও ওর হাতের রুপোর বালাটা নাড়তে নাড়তে বলল, নয়না।

বললাম, বেশ। নায়িকার নাম তা হলে নয়নাই থাকবে। তোমার নিজের নামের নায়িকা হবে— তোমার ভয় করবে না?

আমি তো বলেছি আপনাকে যে, আমি কাউকে ভয় করি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, গল্প গল্পই। গল্প পড়ে আবার আমাকে সলিসিটারের নোটিশ দিয়ো না যেন।

ও আমার কথা ঘুরিয়ে বলল, জানি, দেব না, কারণ গল্প গল্পই।

তারপর চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

ওর দিকে চেয়ে ভাবলাম, এ গল্প সত্যি সত্যি লেখার হয়তো দরকার ছিল না। কিন্তু নয়নার প্রতি আমার ভালবাসা যে নিছক খেলা নয়, নিছক ছেলেমানুষি নয়, নিছক পাগলামিই নয়, নয়নাকে তা জানানো দরকার। নয়নাকে মুখে যা বলতে পারিনি, চিঠিতে যা লিখতে পারিনি, তা আমি এই গল্পে বলতে পারব। আমার যা ছিল, সব যে ওকে আমি দিয়ে ফেলেছি, তা ওর জানা দরকার। আমার এই অসহায়তা সম্বন্ধে ওর একটু ভাবা দরকার।

যখন রোজ একটি করে চিঠি লিখে নয়নাসোনাকে এবং তার বাড়ির অন্যান্যদের আমি আর বিব্রত করব না— তখন আমার এই বই নয়না হাতের কাছে রাখতে পারবে। কখনও যদি কোনও মেঘলা দুপুরে কি কোনও উদাস বাসন্তী রাতে কখনও ভুল করে তার এই পাগলকে মনে পড়ে, সে তখন আমার এই গল্পের দিলরুবা নেড়েচেড়ে দেখবে। আমি মৃত্যুর পর যেখানেই থাকি না কেন, সে মুহূর্তে একটি সুন্দর কাচপোকা হয়ে জানালা দিয়ে উড়ে এসে সেই দিলরুবার দুঃখের সুরে গলা মিলিয়ে নয়নার কানের কাছে গান গাইব। নয়না যদি আমাকে কোনওদিন একটুও ভালবেসে থাকে, তা হলে সেই মুহূর্তে সেই কাচপোকার করুণ কান্না সে ঠিক চিনতে পারবে। হয়তো আমার জন্যে তার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এই বইয়ের উপরেই পড়বে।

তাই, একে শুধু গল্পই বা বলি কেন! এ যে অনেক কিছু। আমার জবানবন্দি।

নয়না বলল, গল্পের নাম ঠিক করেছেন?

না। ভাবছি— হলুদ বসন্ত।

কেন? আমার নাম কেন?

বাঃ রে, তোমার গল্প, তোমার নামের নায়িকা, আর তোমার সোহাগী নামের নাম হবে না? তুমি যে সত্যিই আমার হলুদ-বসন্ত পাখি।

সত্যি? ওই নামের কোনও পাখি আছে?

নেই? ভারী সুন্দর পাখি। আমি ছোটবেলায় না চিনে একটি পাখি মেরেছিলাম। উড়িষ্যায়। এত কষ্ট হয়েছিল কী বলব। কী যে সুন্দর পাখি। হুবহু তোমার মতো।

জানি না। আপনি কী যে করছেন। কী সব লিখছেন। শেষকালে লোকে ভাবুক ভুল কিছু।

আমার বুকের মধ্যেটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। বললাম, লোকে কী ভাববে? নয়না ঋজু বোসকে ভালবাসত? তোমার কোনও ভয় নেই সোনা। লোকে তা ভাববে না। যা সত্যি নয়, যা আগাগোড়া মিথ্যা, তা তারা কেন ভাববে? তারপর একটু থেমে বললাম, তোমাকে আমি কাঙালের মতো চেয়ে নিজেকে নিঃশেষ করেছি মাত্র। তুমি তো আমাকে কিছুমাত্র দাওনি, ভালবাসনি, অন্যায় করোনি, তাই তোমাকে ভুল বোঝার কিছুই নেই এতে। তুমি বাস্তবে যেমন শীতল, নিষ্ঠুর এবং মহৎ, তোমাকে তেমনি করেই আঁকব।

আর আপনাকে?

আমার মতো হীন, নীচ ও বঞ্চিত করে।

অনেকক্ষণ পর ও আমার চোখের দিকে সোজা একবার চাইল। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল।

একটু পরে বললাম, কিছু খেয়েছ?

হ্যাঁ। লেমন স্কোয়াস খেয়েছি।

আর কিছু খাবে?

না। অনেক দেরি হল। এবার উঠি।

উঠবে?

হ্যাঁ, আজ উঠি।

মনে হল, আমার সমস্ত আনন্দ, ওকে চোখের সামনে দেখার আনন্দ, ওকে সামনে বসিয়ে অনর্গল কথা বলার আনন্দ— সব আনন্দ শেষ হয়ে গেল।

বললাম, তুমি এলে বলে খুব ভাল লাগল।

আপনার কাছে আসতে আমারও খুব ভাল লাগে।

কেন?

জানি না। হয়তো আপনার মতো এমন একজন বন্ধুর আমার খুব দরকার। এমন বন্ধু হয়তো আমার আর নেই বলে।

গেটের কাছে এসে বললাম, যাবে কীসে? গাড়ি কোথায়?

গাড়ি তো দাদা নিয়ে বেরিয়েছে। বাসে চলে যাব।

থাক। দাঁড়াও বাসে যাব বললেই তো পুজোর দিনে বাসে যেতে পারবে না। আমি গাড়ির চাবিটা নিয়ে আসছি। পৌঁছে দেব।

ভাবলাম, তাও আরও দশটা মিনিট তো ওর সঙ্গে একা থাকতে পারব। ও জানে না, ওর উপস্থিতিটাই আমার কাছে একটা কতবড় পুরস্কার।

গাড়িতে নয়না বলল, ঋজুদা, আজ রাতে প্রতিমা দেখাতে নিয়ে যাবেন? রানি রাসমণির বাড়ির প্রতিমা নাকি খুব ভাল হয়েছে।

কখন যাবে?

এই আটটা-ন'টা নাগাদ।

বেশ। আমি যাব। তুমি তৈরি হয়ে থেকো বাড়িতে।

আচ্ছা।

নয়নাকে নামিয়ে দিয়ে এলাম বাড়িতে।

১১

যতিদের বাড়ি শ্যামবাজারের কাছাকাছি।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে গাড়ি রেখে নামলাম।

পথে কত লোক। কত বেলুন, কত মেলা, কত হাসিখুশি শিশু, কত দুঃখভোলা দুখী। পুজোর ওই ক'টা দিনে ভারী ভাল লাগে। সবকিছু ভাল লাগে।

যতিদের বাড়ির সামনে বেশ বড় প্যান্ডেল হয়েছে। পুজো হচ্ছে ভিতরের চত্বরে। অ্যামপ্লিফায়ারে পুরুতমশাই মন্ত্রোচ্চারণ করছেন।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

যতিদের গেটের বাইরে, দিল্লি দেখো, বোম্বাই দেখো, কালকা গাড়ি, কোলকাত্তা দেখো হচ্ছে। চোঙাওয়ালা কলের গান বাজছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোল গোল চোঙে চোখ লাগিয়ে অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যাবলী চোখ দিয়ে গিলছে।

গান শুনে থমকে দাঁড়াতে হল। হেমন্ত মুখার্জির রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজছে— "পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়, আমার ঘরে থাকাই দায়"— কিন্তু রেকর্ডটি এমন স্পিডে বাজছে যে মনে হচ্ছে যেন ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস চলছে। কোঁত কোঁত করে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

পত্‌দিয়েকে। যায়গোচলে।
ডাক্‌দিয়েসে। যায়্—
আমার্। ঘরেথাকাই দায়্......

সে এক বীভৎস আওয়াজ। একা একাই হাসতে লাগলাম। কলকাতার পথেঘাটে এমন কত মজাই না আছে। বিনি-পয়সার মজা।

যতি 'এসো এসো' করে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে গেল। একটি ঘরে রঞ্জন সুগত ওরা সবাই গল্প করছিল। সে ঘরে নিয়ে গেল।

সুগত শুধোল, অঞ্জলি দিয়েছ?

দিয়েছি।

চলো আর একবার দেবে।

আরে নাঃ, খেয়েছি যে।

কী খেয়েছ?

চা।

আরে চা আবার খাওয়া নাকি?

চলো চলো। একা একা ভাল লাগে না।

অগত্যা যেতে হল।

ডাকের সাজের ঠাকুর। তেলতেলে মুখ। লাবণ্য চুঁইয়ে পড়ছে। চোখ দুটি ব্যক্তিত্বসম্পন্না। চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, এ দেবীর কাছে ভরসা করে কিছু চাওয়া যায়— চাইলে হয়তো পাওয়া যাবে।

ফুল বেলপাতা হাতে নিয়ে পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। কেন হয় জানি না, এই মন্ত্রের মধ্যে কী যেন জাদু আছে— একবার দু'বার বললেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে; নাভির কাছটা পিনপিন করে ব্যথায়, মনে হয় যেন যুগযুগান্ত ধরে এমনি ভক্তিভরেই পুজো করে আসছি।

তিন-তিনবার অঞ্জলি দেবার পর— সকলে মাথা নিচু করে গড় হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। আমিও মাথা নিচু করলাম। কিন্তু মায়ের কাছে কী কামনা করব ভেবে পেলাম না। নয়নার মুখটি মনে পড়ল। একটু আগে ও যখন আমার ঘরে বসে ছিল— সেই পুজোর সকালের শুচি-মুখটি মনে পড়ল। খুব ইচ্ছে হল বলি, ঠাকুর, তুমি আমার নয়নাকে কেবল আমার করে দাও— এ জন্মের মতো, বরাবরের মতো, আমার একার করে দাও। ও আমার ভালবাসা চিনতে পারুক।

কিন্তু পরক্ষণেই কী যেন হল। কোনও অদৃশ্য হাত যেন আমার মুখ চেপে ধরল। মনে হল, মা বছরে মোটে তিনদিনের জন্য আসেন, তাঁর কাছে নিজের জন্যই চাইব শুধু? সে বড় স্বার্থপরতা হবে। তার চেয়ে কামনা করি, নয়না আমার সুখী হোক, দশজনের একজন হোক, যেভাবে ও সুখী হতে চায়, সেভাবে হোক। ও বাংলাদেশের সেরা মেয়ে হয়ে উঠুক। এবং এই কামনা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যে মাঝে মাঝে উদারও হতে পারি, সবসময় যে হ্যাংলামি করি না, এইটে জানামাত্র ভীষণ গর্বও হতে লাগল। ভারী ভাল লাগতে লাগল। মহাষ্টমীর সকালটা যে অভীষ্ট সিদ্ধির সকাল নয়, এ যে মঙ্গলকামনার সকাল, এইটে ভেবেই ভীষণ আনন্দ হল। আমিও মাঝে মাঝে বড় হতে পারি। এ জানা যে কত বড় জানা, সে কী করে বোঝাব!

অঞ্জলি দিয়ে ফিরে এসে, সকলে মিলে সেই ঘরে গুলতানি শুরু হল। সুগত বলল, তা হলে আমাদের যাওয়া ঠিক। কী বলো যতি?

নিশ্চয়ই। পাক্কা।

যতি বলল, ঋজুদাকে বোলো না, ও খালি দর বাড়ায়। আর যেন কেউ কাজ করে না।

বললাম, কাজ করবে না কেন? এমন চাকরি তো কেউ করে না। করলে বুঝতে।

যাঃ যাঃ, তোর খালি বাজে কথা। রঞ্জন বলল।

বুঝলাম। তা যাবে ঠিক কোন জায়গায়?

হাজারিবাগ। সেখান থেকে কুসুমভা। ক্যাম্প করা যাবে।

তার মানে বেড়ানো। বিগ-গেমস্ তেমন কিছু হবে না।

বাঃ, হবে না কেন? গত বছরই সুগত একটা কোটরা মারল ছুলোয়াতে। শুয়োর আছে অনেক। তা ছাড়া পাখির প্যারাডাইস। চিতাও কম নেই।

যতি বলল, সুগতদা তো কালি-তিতির ও মুরগি আর রাখেনি ওখানে। সব শেষ।

সুগত বলল, এমন বাড়িয়ে বলিস না, মানে হয় না।

আমি বললাম, বেশ চল। শিকার হোক চাই নাই হোক, তিন-চার দিন জঙ্গলে থাকা তো হবে। কুসুমভা আমার বড় ভাল লাগে। তা ছাড়া আমাদের ছোটবেলার কত স্মৃতি ছড়ানো আছে ওখানে— কী বল সুগত?

যা বলেছ।

মনে আছে ঋজু, সেই বর্ষার রাতে ধানখেতে কাড়ুয়ার সঙ্গে ছোটবেলায় খরগোশ মেরে বেড়ানো?

বললাম, আছে, আর মনে আছে, সেই রাত আড়াইটে নাগাদ মেঘ ফুঁড়ে পানুয়ানা টাঁড়ের দিকের আকাশে কেমন চাঁদ উঠল?

সুগত বলল, মনে নেই? কী বলো! ও চাঁদের কথা আমি জীবনে ভুলব না।

রঞ্জন বলল, রেমিনিসেন্স ছাড়— তা হলে আমরা যাচ্ছি?

যতি বলল, হ্যাঁ, তা তো যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে নিয়েই ভয়। মনে আছে গৌরী-কারমার কাছে সেবারে কার পোষা শুয়োর মেরেছিলে জংলি ভেবে? কী কেলেঙ্কারি!

রঞ্জনের এটা বড় দুর্বল স্থান। চটে গিয়ে বলল, যাঃ যাঃ, ওরকম সকলেরই দু'-একবার ভুল হয়। ঋজুকে জিজ্ঞেস কর না, কার সঙ্গে গিয়ে ও মির্জাপুরে শম্বর ভেবে পা-বাঁধা ঘোড়াকে গুলি করেছিল। আমার বেলাই তোদের যত সব মনে থাকে।

অনেকদিন পর জমিয়ে আড্ডা মারা হল। ঠিক হল, বিজয়াদশমীর একদিন পর ভোরে আমরা হাজারিবাগের দিকে রওনা হচ্ছি। যতির জিপেই যাওয়া হবে। আমি, যতি, রঞ্জন, সুগত। হাজারিবাগে এক রাত সুগতদের বাড়ি কাটিয়ে পরদিন ভোরে কুসুমভা। কুসুমভায় তিন-চার দিন থেকে আবার ফেরা হবে কলকাতায়।

নয়না বলেছিল রাত আটটা-ন'টা নাগাদ যেতে। সাড়ে আটটা নাগাদ ওদের বাড়ি

গেলাম। দেখলাম নয়না নেই। ওর দিদি ময়নাদি সেজেগুজে বসে আছে। ময়নাদি এ ক'বছরে যা মোটা হয়েছে তা বলার নয়। অথচ বিয়ের আগে দারুণ ফিগার ছিল। বাঙালি মেয়েরা যে কেন এমনি হয় জানি না। চা-বাগানেও দেখেছি, সাহেব ম্যানেজারের স্ত্রীরা সারাদিন বাগান করছে, রান্না করছে, ঘরের কাজ করছে, আর বাঙালি ম্যানেজারের স্ত্রীরা দিনরাত ঢাউস বজরার মতো খাটে-বাঁধা অবস্থায়, বেঁকে শুয়ে, হয় ঘুমোচ্ছে, নয় নভেল পড়ছে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। নয়নাও হয়তো বিয়ের পর এরকম হয়ে যাবে। ইস, ভাবা যায় না।

শুধোলাম, নয়না নেই?

না। ও একটু পুজো মণ্ডপে গেছে। এক্ষুনি আসবে। তোমাকে বসতে বলে গেছে।

আপনি একা যে? দিলীপদা কোথায়?

আর বলো কেন ভাই? ছুটির মধ্যেও কাজ করে বড়সাহেবকে প্লিজ করছে।

মনে মনে বললাম, এইরকম করে রোজগার-করা টাকায় তৈরি বাড়ি যেন ধসে যায়। কোনও মানে হয়?

ভাবছি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

অবাক হলাম; বললাম, কোথায়?

প্রতিমা দেখতে।

হেসে বললাম, বেশ তো! খুব আনন্দের কথা।

কিন্তু মনে মনে নয়নার উপর এমন রাগ হল যে কী বলব! ও কি জানে না যে, ও একটু একা আমার সঙ্গে থাকলে আমার কতখানি ভাল লাগে? আমি কি ওদের ড্রাইভার যে, পুজোর দিনে ওর মোটা দিদিকে প্রতিমা দেখিয়ে বেড়াব? তা ছাড়া সুজয় ওয়ার্থলেসটা কী করছে? সে নিশ্চয়ই ইয়ারদোস্তি নিয়ে আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। আর আমারই যেন কোনও বন্ধু-টন্ধু থাকতে নেই। তাদের সঙ্গে যেন আমি আড্ডা মারতে পারতাম না। রাগে গা-জ্বালা করতে লাগল।

এমন সময় নয়না এল। সঙ্গে নীতীশকে নিয়ে।

আবদারে গলায় বলল, ঋজুদা, নীতীশদাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব কিন্তু।

জোর করে হাসলাম, বললাম, বেশ তো। ভাল কথা।

এ যাত্রা নীতীশের অগস্ত্য যাত্রা হলেই ভাল হত। কী কুক্ষণেই আমি আজ এখানে এসেছিলাম। যদিও বা ময়নাদিকে সহ্য করা যেত— তার উপর নীতীশ— সোনায় সোহাগা। অফ-অল-পার্সনস্ নীতিশ। নীতীশ সেন।

সত্যি, নয়না কী ভাবে আমাকে? আমি ওকে ভালবাসি বলে কি ও মনে করে, ও আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করাবে? ও বললেই বা আমি করব কেন? মহাষ্টমীর সন্ধেটাই আমার মাঠে মারা গেল। নীতীশ সেনের ড্রাইভার হয়ে প্রতিমা সন্দর্শনে যাব। দরজা খুলে সাহেব মেমসাহেবদের নামাব-ওঠাব। ভাবতে পারি না। আমি যথার্থই একটি কুকুর।

আমাকে দেখে নীতীশ দেখানো বিনয়ের হাসি হাসল।

বলল, কেমন আছেন?

এই চলে যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। আপনি?

ভাল আছি।

ছুটি ক'দিন?

দশমীর পরের দিনই চলে যাব সকালের প্লেনে।

বললাম, আমি গত মাসে গেছিলাম একবার শিলং। আপনার ঠিকানা ছিল না, তাই দেখা করতে পারিনি।

ওহোঃ, আগে জানলে খুব ভাল হত। আমাদের কোম্পানির গেস্ট-হাউসে থাকতে পারতেন।

বুঝলাম. চাল দেখাচ্ছে। কেন? আমার কি থাকবার জায়গা নেই?

বললাম, আমি পাইন-উডে ছিলাম।

বলল, ওঃ তা হলে তো কথাই নেই।

নয়না ভিতর থেকে ফিরে এসে বলল, চলুন যাওয়া যাক।

সবাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

বলবার কিছু নেই। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। নীতীশ সেন আমার পাশে। সেই জীবনানন্দ দাশ নাটোরের বনলতা সেনকে ভালবেসেছিলেন, আর আমি শিলঙের নীতীশ সেনকে ভালবেসেছি— মধ্যে বেবাক সমুদ্দুর! একটি ট্রাফিক পুলিশ আচমকা হাত তুলল। কোনওক্রমে ব্রেক কষলাম। ভিতরে ভিতরে ভীষণ টেনশনে ছিলাম। আমি মেজাজ দেখালাম। সে কী একটা বলল। আমি ওকে অগ্রাহ্য করে গাড়ি চালিয়ে দিলাম— ব্যাটা নম্বর নিল।

আজকালকার লিটল-লার্নিং-ডেঞ্জারাস কনস্টেবলদের কিছু বলেও পার পাবার উপায় নেই। তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেবে। আগেই ভাল ছিল। এক গাল হেসে বলতাম, "গলতি হো গ্যয়া পাঁড়েজি"। পাঁড়েজি গোঁফ ঝুলিয়ে, গাল ফুলিয়ে বলত, "ঠিক্কে হ্যায়, গল্‌তি সব্‌হিকা হোতা। ফিন গল্‌তি মত্‌ কিজিয়ে"।

নীতীশ মন্তব্য করল, কলকাতায় গাড়ি চালানো আজকাল— সত্যি ডিসগাস্টিং। ভীষণ স্ট্রেন হয়।

পেছন থেকে নয়না বলল, এমন কিছুই না। ঋজুদা একটুতে রেগে যান। বড় অধৈর্য উনি। এ জন্য আরও বেশি স্ট্রেন হয়। তা ছাড়া বললে কী হবে ঋজুদা, আপনি বেশ জোরে গাড়ি চালান।

ময়নাদি বললেন, তোর দিলীপদা কিন্তু খুব সাবধানী। বলেন, শহরে কুড়ি মাইলের বেশি জোরে গাড়ি চালানোই উচিত নয়। উনি কিন্তু খুব আস্তে আস্তে গুটগুট করে গাড়ি চালান।

এমন রাগ হল যে ইচ্ছে হল বলি, গুটুগুটু বাবুর বাবা বোধহয় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান ছিলেন। নইলে গুটুগুটু বাবু অমন ইশপ ফেব্‌লের কচ্ছপের মতো চলবেন কেন?

জানবাজারে রানি রাসমণির বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। বেশ ভিড়।

চত্বরে ঢুকলাম।

নয়না এই রাতে আমার দেওয়া শাড়িটি পরেছে। আমাকে নিঃসন্দেহে সম্মানিত করেছে। নইলে, মহাষ্টমীর রাতে আমার দেওয়া শাড়ি পরত না।

নয়না আর নীতীশ আগে আগে চলেছে।

নীতীশ একটি সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে, আর ধুতি। পান খেয়েছে। হিরো হিরো তাকাচ্ছে। যাচ্ছে, যেন রাজকুমার। ছেলেটা সত্যিই আমার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল। ভগবানই আমাকে মেরে রেখেছেন। আমার চেহারা ভাল হলে কি আর নয়না আমাকে এমন করে ব্যথা দিতে পারত? একটু না একটু ভাল বাসতই।

নয়নাকে খুব খুশি খুশি লাগছে। নয়না ওর খুব কাছ ঘেঁষে হাঁটছে। দু'জনে কী যেন বলাবলি করছে— নয়না হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে— নীতীশ বাধ্য-বেড়ালের মতো ওর কথা শুনছে— ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি না— ঢাকের শব্দে সব কথা ডুবে যাচ্ছে। ময়নাদি আমার পাশে পাশে আসছিলেন। হঠাৎ বললেন, এই ঋজু, অত তাড়াতাড়ি যেয়ো না। আমি হারিয়ে যাব।

দাঁড়ালাম।

বেশ বললেন ময়নাদি। উনি যেন ছুঁচ। হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নয়না আর নীতীশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আমি যে আছি— আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছে নয়না, মনে হচ্ছে। খুশিতে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে আছে। দুধ্‌লি হাঁসের মতো সুখের জলে বিলি কাটছে।

বেশ লাগছে কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়ানো ওদের দু'জনকে।

নয়নার সরু কোমর, চুড়ো করে বাঁধা চুল, চমৎকার মরালী-গ্রীবা।

নীতীশের সুন্দর, দীর্ঘ চেহারা, ধবধবে রং, সব মিলিয়ে চমৎকার মানিয়েছে।

পরমুহূর্তে সংবিৎ ফিরে এল। চমকে উঠলাম।

আমি কি নয়নার দাদু যে, নাতনি-নাতজামাইকে জোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আহ্লাদে আহা-আহা করছি?

এতদিনে নিজের শত্রু নিজে চিনলাম না?

শত্রুকে বাহবা দিচ্ছি।

আমার কপালে দুঃখ নেই তো কার কপালে আছে?

এতক্ষণ ব্যাপারটা সিরিয়াসলি ভাবিনি। হঠাৎ ঢাকের শব্দ, কাঁসরের শব্দ, আরতির নৃত্য থেমে যাওয়াতে— একটি নিবিড় ক্ষণিক নিস্তব্ধতা— যা একমাত্র অনেক লোকের ভিড়েই অনুভব করা সম্ভব, তা সারা চত্বরে, ঠাকুর ঘরে, প্রত্যেকের মনে মনে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই একটি শিশু কেঁদে উঠল। একজন বৃদ্ধ থামে মাথা ঠেকিয়ে মা! মা! করে উঠলেন।

কিন্তু সেই একটি নিস্তব্ধ মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার ভিতরের সবকিছু ওই মুহূর্তটির মতোই নিস্তব্ধ, শীতল, ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল। মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে

লাগল। নয়না আর নীতীশের কথা ভেবে। সত্যি সত্যিই আমার নয়নাসোনা আমাকে একটুও ভালবাসে না। এই কথাটি প্রতি মুহূর্তে জানি, নতুন করে বুঝতে পাই, তবু যেন কেন মনে-ধরে বিশ্বাস করতে পারি না। যেদিন একথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করব সেদিন এ পৃথিবীর উপর, জীবনের উপর, সব আশা, সব ভরসা, সব ভালবাসা আমার চলে যাবে। আমি তখন এই আমি থাকব না। আমার কিছুই আর বাকি থাকবে না।

নয়না পেছন ফিরল। হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল। চেঁচিয়ে বলল, ঋজুদা, হারিয়ে গেলেন কেন? আসুন।

ভিড় ঠেলে আমি ওর দিকে এগোতে লাগলাম।

অনুক্ষণ তো আমি হারিয়েই যাই— ভাগ্যিস নয়না মাঝে মাঝে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে।

১২

রঞ্জন বলল, এই যতি, কী হচ্ছে কী? আস্তে চালা না। জিপ উলটে মারবি নাকি?

মারবার মতো ড্রাইভার আমি নই।

সুগত বলল, তবু, মেটাল-ফেটিগ বলে একটা কথা আছে তো। এত জোরে চালাবার তোমার কী দরকার বাবা?

দরকার কিছুই নেই। এমনিই চালাই। মজা লাগে বলে।

এবার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে, বাগোদরে বাঁয়ে মোড় নিলাম। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কলকাতা থেকে বেরোতে বেরোতেই দেরি হয়ে গেছিল। এখন পথটা এঁকেবেঁকে চলেছে শালবনের মাঝে মাঝে। মাইল আট-নয় গিয়ে, কোনার ড্যাম, গোমীয়া ইত্যাদি যাবার পথ পড়বে বাঁয়ে। আমরা সোজা চলে যাব। টাটিঝারিয়া হয়ে হাজারিবাগ।

যাই বল ঋজু, হাজারিবাগে এলেই আমাদের যেন কীরকম ভাল লাগে, তাই না?

রঞ্জন বলল, যেন কী এক স্পেশাল ভাল-লাগা।

বললাম, আসলে আমরা এমন একটি বয়সে বন্দুক হাতে এখানের বনে-পাহাড়ে পাগলামি করে বেড়িয়েছি যে, সে বয়সে সব কিছুকেই ভাল লাগত। চোখটা সব কিছুতেই রামধনু দেখত।

যতি বলল, এমন করে বলছ, যেন কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লির মধ্যে বসে কথা বলছ। তবে, সে বয়সটা সত্যিই ভাল বয়স। মানে, যে বয়সে কাক ডাকিলে কোকিল বলিয়া ভ্রম হয়, পরের বোনকে নিজের বোন অপেক্ষা অধিক সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। সেই বয়স।

তুই বড় ফাজিল হয়েছিস যতি। বড়দের সামনে কী করে কথা বলতে হয় জানিস না।

যতি একটি হেয়ারপিন-বেন্ড নেগোশিয়েট করতে করতে বলল, প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষেণ......

রঞ্জন বলল, তোর আজকাল সত্যিই বেশি জ্ঞান হয়ে গেছে।

যতি ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, শাস্ত্র পড়েছ? শাস্ত্রে লিখেছে, অজ্ঞানকে জ্ঞান দিবে। হনুমানকে কলা খাওয়াইবে।

অনেকক্ষণ একটানা টপ গিয়ারে জিপ চলছে গোঁ গোঁ করে বাঘের বাচ্চার মতো। সুগতটার ঝিমুনি মতো এসেছে। মাঝে মাঝে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঝিমিয়ে নিচ্ছে। হেডলাইটের আলোটা লাফাতে লাফাতে চলেছে গাড়ির আগে আগে।

হঠাৎ সুগত ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠে বলল, আরে থামো থামো। চলেছ কোথায়? টাটিঝারিয়া পেরিয়ে এলে যে।

চা খাবে না?

যতি কুতকুত করে হেসে উঠল। বলল, দাদার ঘুমটা ভালই এসেছিল। তুমি কি খোয়াব দেখছ? টাটিঝারিয়া নয় ওটা। টাটিঝারিয়া সামনে। দাঁড়াব নিশ্চয়ই। ঠান্ডায় আমার হাত জমে গেছে। স্টিয়ারিং ধরতে পাচ্ছি না।

বললাম, সত্যি কথা। তুমি একটানা চালাচ্ছ যতি অনেকক্ষণ। এবার আমায় দাও।

ও বলল, চলো টাটিঝারিয়া অবধি। এসে গেছি। তারপর নিয়ো।

টাটিঝারিয়ার পণ্ডিতজির দোকানে চা খাওয়া হল। আর ছোট ছোট চৌকো-চৌকো নিমকি। দোকানে শুনলাম, এই রাস্তায় এগারো মাইলের মাথায় একটি বড় বাঘকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে রাস্তা পার হতে।

যতি বলল, ঋজুদা, রাইফেলটা বের করে রাখি? যদি পাওয়া যায় পথে।

রঞ্জন বলল, থাম তো তুই। এরকম কত রাস্তা-পেরুনো বাঘের গল্প শুনলাম এ পর্যন্ত। কারও সঙ্গেই তো কখনও দেখা হল না। বাঘ তোর মতো বরিশালিয়া কিনা যে, হাটখোলায় বসে কীর্তন গাইবে।

যতি টিপিকাল বরিশালিয়ার মতো উত্তেজিত হয়ে বলল, এই তো তোমার দোষ। রসিকতা করো করো, কিন্তু বদ-রসিকতা কেন?

এখন জিপ চালাচ্ছি আমি। কেন জানি না, আমার হাতে থার্ড গিয়ারটা মোটে বসছে না। কেবলই স্লিপ করছে। যতি পেছন থেকে ডিরেকশন দিচ্ছে— হ্যাঁ, পুরো ক্লাচ করো, একটু উপরে ঠেলে ফেলো লিভারটাকে,— হ্যাঁ। এমন সময় ও-পাশ থেকে একটি ট্রাক আসল। স্পিড কমালাম। সেকেন্ড গিয়ারে দিলাম— আবার থার্ড গিয়ারে দিতে গেলাম এবং আবার সেই গন্ডগোল— এবং সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন ফিসফিস করে বলল, চোখ, চোখ— বাঘের চোখ!

এদিকে গিয়ার ফাঁসার উপক্রম। কোনওরকমে ম্যানেজ করলাম। অ্যাকসিলারেটর একদম ছেড়ে দিলাম— এমন সময় আমিও দেখলাম, জিপের হেডলাইটে পথের ডানদিকে শালবনের আড়ালে একজোড়া লাল বড় চোখ জ্বলজ্বল করছে। দেখতে দেখতে, জিপ গড়াতে গড়াতে প্রায় তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

আরে, এ যে সত্যি সত্যিই বাঘ। রীতিমতো বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বেশ কায়দার সঙ্গে, কলার তুলে আস্তে আস্তে রাস্তা পেরোল। ডানদিক থেকে বাঁয়ে। বন্দুক রাইফেল সব পেছনে বাক্স-বন্ধ। তার উপরে যতি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছে।

বাঘটা রাস্তা পেরিয়েই, একটি বড় লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বাঘটা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে, যতি অদ্ভুতভাবে খিকখিকিয়ে হাসতে লাগল। সে এক বিচিত্র হাসি। তারপর রঞ্জনের কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, কী হে সবজান্তা, বাঘ হাটখোলায় কীর্তন গায় কি না দেখলে? তোমাদের দ্বারা শিকার-টিকার হবে না। তোমরা বেহালা বাজাও। এমনভাবে বন্দুক প্যাক করে রেখেছ যে বন্দুকের বাক্স না বেহালার বাক্স, বোঝে কার সাধ্যি।

সত্যি সত্যিই ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় আমরা সকলে অবাক হয়ে গেছিলাম।

সুগত বলল, তোমাকেও বলিহারি যাই ঋজু, আর একটু হলে তো বাঘের লেজে বাম্পার ঠেকত। অত কাছে যাবার কী দরকার ছিল?

বললাম, আমি কি ইচ্ছে করে গেছি? মুখ নিচু করে ভাল করে গিয়ারটাকে নিরীক্ষণ করছিলাম। ইতিমধ্যে গাড়ি গড়িয়ে গেছে।

যতি বলল, একটু হলে ঝুলিয়েছিলে। নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের থাপ্পড় খাবার মানে হয়?

রঞ্জন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা যা বলেছিস। হাতে বন্দুক থাকলে ব্যথা কম লাগত।

হাজারিবাগের আলো দেখা যাচ্ছে। কনহারি—সিলাওয়ার আর— সীতাগড়ার পাহাড় ঘেরা হাজারিবাগ। যতবার আসি, ততবার নতুন করে ভাল লাগে!

গয়া রোডে সুগতদের বাড়ি। চমৎকার। ছবির মতো। খিদমদগার চমনলাল বুদ্ধিমান লোক। ইচ্ছে করলে কানে শোনে, নইলে শোনে না। খিচুড়িটা দারুণ রাঁধে। হাসিটা কর্ণমূলে পৌঁছোনো এবং নয়নাভিরাম।

পরদিন ভোরে উঠেই এককাপ করে চা খেয়ে কুসুমভার দিকে বেরিয়ে পড়া গেল। বড়কাগাঁও রোড দিয়েও যাওয়া যায়— সিমারীয়া যাবার রাস্তা দিয়েও যাওয়া যায়। যখন আমাদের কারওই কোনও বাহন ছিল না— তখন সিমারীয়ার পথে বানাদাগ অবধি আমরা সাইকেল-রিকশায় চড়ে আসতাম— কিচিং কিচিং করতে করতে। তারপর ঝুলি-ঝালা নিয়ে পায়দল মারতাম খোয়াই ভেঙে শালবনের পথ দিয়ে। অনেকখানি পথ।

পথে বোকারা নদী পেরুতে হত। নদীর বালুরেখায় কোটরা হরিণ খেলা করত। বহুদূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই পালাত। পথের বাঁদিকের ঝাঁকড়া অশথগাছে বড় বড় জিরহুল ফুলের মতো জাঙ্গিলেরা শীতের সকালের রোদ পোয়াত! টাঁড় থেকে কালি-তিতির ডাকত। সির্কার দিক থেকে বনমোরগ ডাকত কঁকরক্ক— ক্কঁ-ঙ্কঁ-ক্কঁ-ক্কঁ। ভারী ভাল লাগত। হাঁটতে হাঁটতে দূরে কুসুমভার মাটির

ঘরগুলি চোখে পড়ত। পুরনো নিমগাছটি। বনদেওতার থানের বটগাছটি। নয়াতালাও-এর উঁচু পাড়।

কাড়ুয়া ছাগল চরাত গ্রামের সীমানায়। টিকি দুলিয়ে দৌড়ে আসত। ওর ভাই আশোয়া আসত। নাগেশ্বরোয়ার ঘরে, নিমগাছের তলায় আমাদের আস্তানা হত।

পুরনো রাস্তা বেয়ে আমরা জিপে করে যাচ্ছি। রাস্তা অবশ্য খুবই খারাপ। তবু, যে সময়ে আমরা এখানে হেঁটে আসতাম, সে সময়ে কোনও গাড়ি যে এখানে আদৌ আসতে পারবে তা ভাবাই যেত না। এখন গ্রামের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সে প্রশান্তি যেন আর নেই। নেই সেই নিস্তব্ধ নিরুপদ্রবতা। কেমন শহর-শহর ভাব হয়ে গেছে। নাগেশ্বরোয়ার ছেলে একটি ছাতার কাপড়ের কালো ড্রেইন পাইপ পরে নিজেকে শাম্মি কাপুর মনে করে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। ভয় হল, এক্ষুনি না হাত পা ছুড়ে—

"ও হাসিনো জুল্‌পোওয়ালো যানে যাঁহা—
ম্যায়ফিল্ ম্যায়ফিল্ হ্যায় শামা,
ম্যায়ফিল্ ম্যায়ফিল্ হ্যায় শামা...

গান না জুড়ে দেয়।

সেই চিৎকারে হয়তো চবুতরার সব কবুতর চটপটিয়ে উড়ে যাবে। যে এক জোড়া রাজঘুঘু ঘুঘুর-ঘু করে ঘুমের গানের নূপুর বাজাচ্ছিল, উদাসী শিশিরভেজা হাওয়ায়— তারা ভয় পেয়ে যাবে। নয়াতালাও থেকে সবক'টি সল্লি হাঁস-সরসরিয়ে দ্রুত পায়ে জল সরাতে সরাতে, শরবনের আড়ালে মুখ লুকোবে। মানে, আমাদের সেই পুরনো কুসুমভা হারিয়ে যাবে।

তবু ভাল লাগে। কলকাতাটা যে কী ক্যাঁটকেটে নাইলন শাড়ি-পরা, ঠোঁটে রংমাখা মেয়ের মতো অন্তঃসারশূন্যা, দরিদ্র, তা জঙ্গলে না এলে বোঝা যায় না। কুসুমভা আমার সেই পুরনো সুরাতীয়া— আমার নয়নার মতো। যার কাছে এলেই নিজেকে স্নিগ্ধ, সুস্নাত মনে হয়।

কুসুমভায় এলেই, রাত কাটালেই আমি সুন্দর সুন্দর সব মৌসুমি ফুলের মতো স্বপ্ন দেখি। আমার ইচ্ছে করে আমার মতো নয়নাও স্বপ্ন দেখুক, ঘুমের মধ্যে কথা বলুক; মাঝরাতের টুণ্ডি পাখির মতো ভাললাগায় শিউরে উঠে, ও পিটি-টুঙ্ পিটি-টুঙ্ করে ঘুমের মধ্যে শিস দিয়ে উঠুক।

কুসুমভাতে দু'দিন হয়ে গেল।

দুপুরে ছুলোয়া শিকার হল। কালি-তিতির, মুরগি, আসকল, তিতির, বটের, ঘরগোশ অনেক কিছু মারা হল। আমি কিন্তু মারিনি।

নয়না আমাকে বারণ করেছিল। অনেকদিন থেকে ও এ বাবদে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে। পাখি মারা নিয়ে। বলেছিল, আপনি যে-পাখিই মারুন, জানবেন আপনি হলুদ-বসন্ত পাখিকে মারলেন। তারপর থেকে নিজে পাখি মারতে পারিনি আর।

সুগত বলেছিল, তুমি একটি ফার্স্টক্লাস হিপোক্রিট।

আমি ওকে বোঝাতে প্যারিনি।

আমি কখনও কারও কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারিনি। নিঃসংকোচে আত্মপ্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। সুগতর মতো দু'-একজন তাদের চোখে, তাদের বুদ্ধির প্রদীপ জ্বেলে আমায় আংশিকভাবে আবিষ্কার করেছে মাত্র। চিলকার ছড়-পরিয়ায় একবার থার্টি-ও-সিক্স রাইফেল দিয়ে একটি কৃষ্ণসার হরিণ মেরেছিলাম। দূর থেকে। গুলিটি মেরুদণ্ডে লেগেছিল। হরিণটি ঝাউবনের বালিতে পড়ে ছটফট করছিল— কিন্তু উঠতে পারছিল না। কাছে দৌড়ে যেতেই দেখলাম দুপুরের রোদে রক্তমাখা হরিণটি খাবি খাচ্ছে। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

কী হল জানি না। নিজের উপর বড় ধিক্কার জন্মাল। জলের বোতল খুলে তার মুখে গবগব করে জল ঢালতে লাগলাম। ঘৃণায় কি অপারগতায় তা জানি না, সে আমার হাতের জল খেল না।

এমন সময় স্থানীয় উড়িয়া শিকারি, মার্কণ্ড এল— এসে আমায় ঠেলা দিয়ে সরিয়ে শট-গান দিয়ে হরিণটির গলায় গুলি করল। একটু কেঁপে উঠে হরিণটি নিশ্চল হয়ে গেছিল।

তখনও সুগত আমাকে বলেছিল যে, আমি ভণ্ড। হয়তো ভণ্ড। কারণ, যে নিজের মনের সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতায় আস্থাবান নয়, তার এমন আংশিক নিষ্ঠুরতায় ভর করে প্রাণী হত্যা করা ঠিক নয়। আংশিক ভণ্ডামির চেয়ে সর্বৈব ভণ্ডামি শ্রেয়।

জানি না। আমি সত্যি সত্যি ভণ্ড কি না জানি না। তবে যখন উড়ে-যাওয়া তিতির কি আসকলের দিকে বন্দুক তুলি— নয়নার মুখটি মনে পড়ে যায়, সেই হলুদ কটকি শাড়িপরা চেহারা— হলুদ-বসন্ত পাখির কথা মনে পড়ে। গুলি করতে পারি না। আমার আবাল্য অভ্যাস, আমার বাহাদুরি-প্রবণতার, প্রশস্তি-প্রাপ্তির সমস্ত প্রয়াস, তখন অসার্থক হয়। বন্দুকের দু'ব্যারেলের মাছির দু'পাশে নয়নাসোনার কালো চোখদুটি ভেসে ওঠে। ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াতে পারি না। কিছুতে পারি না। আর বোধহয় কোনওদিন আমি পাখি হরিণ মারতে পারব না। সুগতরা আমায় ওদের দল থেকে তাড়িয়ে দেবে। ওরা আমার কথা বুঝতে পারে না— আমায় ঠাট্টা করে— বলে, নবদ্বীপে গিয়ে বোষ্টম হও। ওরা যে কেউ আমার মতো করে ভালবাসেনি কাউকে— কোনওদিন। আমায় তাই বোঝে না।

সন্ধে হয়ে গেছে। আগামী কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। একা একা পানুয়ানা-টাঁড়ের দিকের জংলি পথ বেয়ে হেঁটে আসছি। বেশ ঠান্ডা। দূরে গোন্দা-বাঁধের উঁচু পাড় একটি পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে। একদল নাকটা হাঁস মাথার উপর দিয়ে চিঁউই-চিঁউই করতে করতে আকাশ সাঁতরে কোনাকুনি উঠে গেল। তাড়াতাড়ি যাচ্ছে ওরা গোন্দা-বাঁধের জলে— ঝুরুক্ঝারির ঝিল থেকে উড়ে আসছে। একটি টি-টি পাখি টিটিরটি-টিটিরটি করতে করতে পথের ডানদিকের জঙ্গলে ডেকে ডেকে উড়ছে। চিতা-টিতা দেখে থাকবে।

আজ টস করা হয়েছে। মাচায় বসবে যতি আর সুগত। সকালে জঙ্গলে একটি হরিণের ন্যাচারাল কিল খুঁজে পেয়েছি আমরা। চিতায় মেরেছে হরিণটিকে কাল রাতে। বিকেল থাকতে ওরা গিয়ে মাচায় বসেছে। রঞ্জন ভাল রাঁধুনে। মুরগি রান্নার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ও কুসুমভাতে।

পথটি একটি টিলার উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে বুরহি-করমের নদী পেরিয়ে সির্‌কার দিকে চলে গেছে। নদীর কালভার্টের উপর বসলাম। পাইপটা ধরাল্যাম।

চমৎকার দুধলি রাত, সুগন্ধি রাত, নিরুপম নির্জনতার রাত। ভাবলাম এমন রাতে নয়নাকে ক্ষমা করা যায়। নয়না শুধু খুশি হোক। আমার মতো সামান্য অকিঞ্চিৎকর ছেলে এর চেয়ে বেশি কী আশা করতে পারে নয়নার মতো মেয়ের কাছ থেকে?

কালভার্টের তলা থেকে একটি বড় গিরগিটি বলে উঠল, ঠিক ঠিক ঠিক। অমনি টি-টি পাখিটা কোত্থেকে জঙ্গল ফুঁড়ে ডাকতে ডাকতে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে উড়ে আসতে লাগল। চিতাটা কি আমার দিকে আসছে? আমি ভয় পেলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এ কোনও শরীরী চিতা নয়, এ আমার ছদ্মবেশী অশান্ত কামনা। আমার এই মুহূর্তের সমস্ত মহত্ত্ব ও উদারতাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে বলে সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে ছায়ার আড়ালে আড়ালে। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। ও আমাকে মহৎ হতে দেবে না। ও আমাকে বরাবর এমনি একজন সস্তা, সামান্য, হীন, সাধারণ মানুষ করে রাখবে। আমি কোনওদিন নয়নার ভালবাসার যোগ্য করে তুলতে পারব না নিজেকে।

১৩

সবাই স্বপ্ন দেখে কি না জানি না, তবে অনেকে দেখে। আমিও দেখি। আমার ধারণা সবাই স্বপ্ন দেখতে শেখেনি।

স্বপ্ন মানে— খুব যে একটা বিরাট কিছু তা নয়। অল্প একটু জমি, এই কাঠা দশেক হলেই চলে— তাতে একটি ছোট বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। ইটালিয়ান ধাঁচের পোর্টিকোওয়ালা। ঘর থাকবে মোটে তিনটি— চারপাশে কাচ থাকবে— শুধু কাচ। প্রচুর জায়গা নিয়ে একটি স্টাডি। চতুর্দিকে বই। বই— বই— রাশীকৃত বই। এক কোনায় ছোট একটা কর্নার টেবল— তাতে একটি সাদা টেবল-ল্যাম্প থাকবে। সেখানে বসে আমি লিখব। ফার্নিচার বেশি থাকবে না। পাতলা এক-রঙা পার্শিয়ান কার্পেট থাকবে মেঝেতে। একেবারে সাদা ধবধবে টাইলের মেঝে হবে। প্রতি ঘরে ঘরে রোজ ফুল বদলানো হবে। চারিদিকে চওড়া ঘোরানো বারান্দা থাকবে। থোকা থোকা বুগেনভেলিয়া লতায় চারদিক ভরা থাকবে। গেটের দু'পাশে দুটি গাছ থাকবে— কৃষ্ণচূড়া নয়, রাধাচূড়া। কৃষ্ণচূড়া বিরাট বড়— ওই ছোট্ট বাড়িতে বিরাট কিছু মানাবে না। বারান্দায় রেলিং থাকবে। সাদা। রট আয়রনের। বাথরুমটা বেশ বড়

হবে, যাতে নয়না গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে ঘুরে শাওয়ারের নীচে চান করতে পারে।

বসন্তকালে লনের চেরি গাছের নীচে বেতের চেয়ারে বসে চা খাব আমরা।আমি আর নয়না। কোনও ভিজে, সোঁদা-সোঁদা-গন্ধ-দিনে চাঁপা ফুলের গন্ধবাহী হাওয়ার সঙ্গে যখন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়বে তখন সেই স্টাডিতে বসে বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে, কি কিছু লিখতে লিখতে আমি কফি খাব— আর নয়না একটা কালো মডার্ন ফ্রেমের চশমা নাকে দিয়ে বেশ ভারিক্কি গলায়, যেন শাসন করছে এমনভাবে, আমাকে বলবে— অত কফি খেয়ো না, লিভারটার কি বারোটা বাজাবে?

কিংবা কোনও গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে চেরি গাছের তলায় পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসব। আমার নয়না স্নান করে, চুড়ো করে চুল বেঁধে সুগন্ধি স্নিগ্ধ ঠান্ডা শরীর নিয়ে পাশে এসে বসবে। সুন্দর ছোট্ট ট্রে-তে করে আমাদের চাকর (একমাত্র চাকর; একটু কমবয়েসি, মানে ১৫-১৬ হলে ভাল হয়, খুব চটপটে হবে) চা নিয়ে আসবে। ট্রে-তেও একটি ছোট্ট ফুলদানি থাকবে, স্যান্ডউইচের প্লেট— পাইপের টোব্যাকো, অ্যাশট্রে সবকিছু। শেষ সূর্যের ম্লান আলো এসে নয়নার গ্রীবা ছোঁবে। নয়নাকে ভীষণ সুন্দর দেখাবে। মেয়েদের সুন্দর না দেখালে আমার খারাপ লাগে। অসহ্য লাগে। নয়না একটু হাসবে। আমি বলব, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তো। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি তুলে নয়না তখন সম্পূর্ণভাবে হাসবে। আমি ওর দিকে অপলক চেয়ে থাকব। দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকব। ঝিরঝিরে হাওয়ায় রাধাচূড়ার ফিনফিনে পাতারা লনের ঘাসে নরম নিভৃত নিরুপদ্রবতার বাহন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। ফোনটা বেজে উঠল। অফিসে বসে স্বপ্ন দেখাটা খুব খারাপ। সব বুঝি, তবু অবাধ্য মনটা বোঝে না। ছোট ছেলের মতো স্বপ্ন দেখে, কল্পনার লাল নীল লালিপপ চুষে চুষে খায়।

হ্যালো।

ঋজু বোসের সঙ্গে কথা বলতে পারি? জড়ানো-জড়ানো গলায় কে যেন বলল।

কথা বলছি।

আমি যতি।

কী ব্যাপার? এত উত্তেজনা কীসের?

উত্তেজিত হয়ে আছি তাই। 'অপারেশন চাইনিজ' সাকসেসফুল।

মানে?

মানে, ছ'দিন চাইনিজ খাওয়া অর্জন করলাম। আধ ঘণ্টা আগে লাভ ইন দ্য আফটারনুনের সঙ্গে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে আমার জিপ নিয়ে মুখোমুখি লড়ে গেলাম। জিপ নিয়ে বনেটের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে একেবারে সামনের সিটের নরম চামড়ার কুশানে।

উদ্‌বিগ্ন গলায় বললাম, ড্রাইভারের কী হল?

কী আবার হবে? হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেশি আর কী হবে? মরে যাবে।

তার বেশি তো আর কিছু নয়। তবে ও জাগুয়ার গাড়ি বিধুমুখীর এ জন্মে আর চড়তে হবে না। যতিটা একটা পাজি। এমনভাবে বলছে যেন সত্যি সত্যিই ড্রাইভারের জন্য ওর কোনও ভাবনাই নেই।

তবু, খুশি হলাম। কেবল চাইনিজ নয়— তোমায় আর যা কিছু খেতে চাও খাওয়াব। তোমার কিছু হয়নি তো?

বিশেষ কিছু নয়। পেছনের পাটির দু'খানা দাঁত ভেঙে গেছে। ভালই হয়েছে। ও দুটো দাঁতে পোকা বড় জ্বালাতন করত। তা ছাড়া মাথা একটু কেটে গেছে— তিনটে স্টিচ করেছে। আমার জন্য ভেবো না। ফাইন আছি।

যাক, তাও বাঁচোয়া, অল্পের উপর দিয়ে গেছে। কাল রাতেই চলো— বাইরে খাওয়া যাক।

কাল যেতে পারব না। আমি তো অ্যারেস্টেড। জামিনে খালাস পেয়েছি। এসব ঝামেলা পুইয়ে নিই— তারপর দিল খুস করা যাবে।

বললাম, শোনো। এসব খরচা-খরচের একটা হিসেব-টিসেব রেখো। রঞ্জন কী বলছে?

সে তো ন্যাকামি করছে এখন। বলছে, কী দরকার ছিল এত বাড়াবাড়ি করার? ড্রাইভারটা যদি মরে যায়? আচ্ছা তুমিই বলো, একটি দেড় লাখ টাকার গাড়ি ধসাতে একটি লোক মরবে তাতে ন্যাকাকান্নার কী আছে? আমি যে প্রাণে বেঁচে গেলাম— সে কথাটা একবারও বলছে না এখন।

বললাম, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, ও একটু নার্ভাস টাইপের— নিজেই হুজুগ তুলে এখন নিজেই পস্তাচ্ছে। যো হুয়া সো হুয়া। যো হুয়া আচ্ছাই হুয়া।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের অফিস সাড়ে পাঁচটায় ছুটি। তা ছাড়া এই খবরটা শোনামাত্র বেশ খুশি-খুশি লাগছিল মনটা। হাতটাকে মুঠো করলাম জোরে— আনন্দ হল—। শালা! রোজ রোজ আমরা ভাঙা অ্যাম্বাসাডরে চড়ব, আর তুমি রোজ লাখ টাকার গাড়ি এনে ফুটুনি মারবে— ননির পুতুল— বিধুমুখী আমার! বেশ হয়েছে। বড় আনন্দ হয়েছে।

এই আনন্দ কীভাবে সেলিব্রেট করব বুঝতে পারছি না। নয়নাকে একটা ফোন করলে হয়। জাগুয়ারের ড্রাইভারটাকে একবার দেখতে যাওয়া দরকার। ওর চিকিৎসাপত্রর যেন কোনও ত্রুটি না হয়। মনে হচ্ছে মরবে না। মনে হচ্ছে যখন, তখন নিশ্চয়ই মরবে না।

নয়নার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে বেশ হয়। এই কলকাতায় কোন চুলোতেই বা আর বেড়াব। যেখানে যাব সেখানেই তো ফুচকাওয়ালা আর ট্রানজিস্টার আর কদাকার কদাকার মহিলারা। যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই। তার চেয়ে নয়নাকে নিয়ে কোনও ভাল ছবি দেখতে গেলে হয়। নয়নাকে এই ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাই হোক— এর কথা বলতেই হবে এবং এ কথা ওকে আজই— এক্ষুনি বলতে হবে। বললেই ও প্রথমে চোখ বড় বড় করে শুনবে, কৌতুকভরে বলবে, সত্যি? তারপরই বকবে—

ভীষণ বকবে। বলবে— ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া জানা বড় বড় ছেলেরা যে এরকম কাজ করতে পারে ভাবতে পারিনি। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমাকে এক্ষুনি গাড়ি থেকে নামিয়ে দিন। এ তো মানুষ খুন করার শামিল। এরকম যদি আপনারা করতে পারেন, তো আরও অনেক কিছু করতে পারেন। ইস, ভাবা যায় না। আপনার মতো ছেলেও...। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওকে শান্ত করতে নিঃসন্দেহে বেগ পেতে হবে। তবু আমার বিশ্বাস আছে ও শেষকালে ক্ষমা করবে। যতি ও রঞ্জনকে ও চেনে না— ওদের ক্ষমা করবে কি না জানি না— কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে যে, অবশেষে ও আমায় ক্ষমা করবে।

ফোনটা ডায়াল করলাম। সুজয়ের ওয়েস্ট জার্মানিতে যাওয়া ঠিক। কয়েক মাসের মধ্যেই যাবে। আজকাল বাড়িতে একটু-আধটু থাকে— ওরকম দিবারাত্রি আড্ডা মারা ছেড়েছে। ও-ই ফোনটা ধরল। বলল, নয়না তো নেই রে। নীতীশ কাল সকালের প্লেনে শিলং চলে যাচ্ছে— তাই নয়না আর ও সিনেমাতে গেছে। এলে কিছু বলব?

বললাম, নাঃ, এমনি। ছেড়ে দাও। তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব। বলেই, ঘটাং করে ফোন ছেড়ে দিলাম।

নীতীশ। নীতীশ সেন। এই নামটা শুনলেই আমার শোণিতস্রোত উলটো ঘুরতে শুরু করে। মি. সিধুর গাড়ি না ভেঙে ওকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। কোনও শট্-গানে, এল-জি ভরে একটি ক্লিন নেক্-শট; অথবা, পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে কানে মারা। মজা বুঝবে। ন্যাকা, মেয়েলি ভাল ছেলে, অসহ্য।

অফিস থেকে বেরুলাম। চৌরঙ্গির মোড় পেরুলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল— মেট্রোর সামনে নয়না আর নীতিশ রাস্তা পার হচ্ছে। মেট্রোয় যাবে। আলোতে ওদের দু'জনকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নীতীশ একটা কালো সুট পরেছে। বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে।

নয়না নীতীশের একেবারে গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে চলেছে।

নয়না বোধহয় কোনও দোকানে খোঁপা বেঁধেছিল সেদিন। একটি কমলারঙা সম্বলপুরি সিল্কের শাড়ি এবং লো-কাট ব্লাউজে ওর গ্রীবাটি অন্য সব দিনের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওই ঝলমলে আলোয় ওকে চিল্কার আকাশের আসন্ন সন্ধ্যায় উড়ে-চলা ফ্লেমিংগো পাখি বলে মনে হচ্ছিল। আমার মাথায় খুন চেপে গেল। কী হল জানি না। কেমন করে হল জানি না। স্টিয়ারিংটাকে শক্ত করে দু'হাতে ধরে যত জোরে পারি অ্যাকসিলারেটরে সমস্ত জোর দিয়ে চাপ দিলাম— গাড়িটা চৈত্র মাসের হাওয়ার মতো হুহু করে এগিয়ে চলল। দু'জনকে একসঙ্গে চাপা দেব— গুঁড়িয়ে ফেলব— চাপ চাপ গাঢ় রক্ত লেগে থাকবে রাস্তায়— কালো সুট আর কমলারঙা শাড়ি রক্তে লাল হয়ে যাবে। ফ্লেমিংগো পাখি ঘাড়-মটকে পড়ে থাকবে কমলারঙা শাড়িতে। পৌঁছে গেছি— পৌঁছে গেছি— আর এক মুহূর্ত— হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে নীতীশ নয়নাকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার আওতা থেকে— কিন্তু অত অল্প

সময়ে ব্রেক কষা সম্ভব হল না— গিয়ে পড়ল গাড়ি সামনের গাড়ির উপরে— সে গাড়ি লাফিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারল তার সামনের গাড়িতে। দু'গাড়িরই দু'ড্রাইভার নেমে এল। এসে আমাকে গালাগালি করতে লাগল। দোষ সম্পূর্ণই আমার। উচিত ছিল চুপচাপ থাকা। আমি উলটে ওদের গালাগালি দিলাম— চেঁচিয়ে বললাম, keep your bloody mouth shut. বলতেই, সামনের লোকটা আমার কলার ধরল। কলার ধরতেই মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না— টেনে মারলাম এক আপার-কাট। লোকটা হেঁচকি তুলে সরে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমবেত সমর্থকবৃন্দ আমাকে চাঁদা করে মারতে আরম্ভ করল। একজন সার্জেন্ট না এসে পড়লে কী হত জানি না। কে যেন খুব জোরে একটা ঘুষি মারল আমার রগের উপর, কপালে— তারপর দেখলাম একটি একটি করে আলোগুলি নিভে যেতে লাগল— ঠান্ডা লাগতে লাগল— মনে হল ঘাড়ের কাছে কেউ যেন ওডিকোলনের শিশি উপুড় করে দিয়েছে। সমস্ত মাথার মধ্যে অনেকগুলো কটকটি ব্যাং ডাকতে লাগল। আর কানের মধ্যে ঝনঝন করতে লাগল নয়নার গলা— কী অসভ্য ড্রাইভার! নীতীশও চেঁচিয়ে কী একটা বলেছিল। শুনতে পাইনি। ভাগ্যিস ওরা কেউ আমায় চিনতে পারেনি।

সার্জেন্ট আসাতে সামনের ভিড় কমল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থানায় গিয়ে ডাইরি করতে হবে। সবকিছু করতে হবে। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করল না। ইচ্ছে করল ঘুমোই।

গাড়ি স্টার্ট করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। জামার বোতাম ছিঁড়ে গেছে। টাই ধরে টানাটানি করাতে গলায় খুব লেগেছে। জল পিপাসা পাচ্ছে খুব। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল না এই অবস্থায়।

পার্ক স্ট্রিটে এসে দাঁড়ালাম। কোথাও বসে এক কাপ কফি খেলে বেশ হত। রুমাল দিয়ে ঠোঁটটা ভাল করে মুছলাম। ঠোঁটের কোনাটা কেটে গেছে। ওরা খুবই মেরেছে; তবু দুঃখ নেই তার জন্যে। আসলে আপশোস, নয়না আর নীতীশকে আমার জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না!

একটা কোনা-কফি নিয়ে সায়ান্ধকারে একটি কোনায় বসে বসে অনেক পুরনো দিনের কথা— অনেক টুকরো ঘটনা চোখের উপর সারি সারি ভেসে-ওঠা ছবির মতো দেখছিলাম। সেসব ছবি দেখতে দেখতে বর্তমানের সবকিছু মন থেকে উবে গেল।

একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। ট্রাম স্ট্রাইক ছিল, শুধু বাস চলছিল। প্রচণ্ড ভিড়। অফিসে বসে হঠাৎ আমার মনে পড়ল নয়নার কলেজ ছুটি হবে। ওই সময় ট্যাক্সি পাবে না— ওই ভিড়ে বাসেও উঠতে পারবে না। বৃষ্টিতে ভিজবে এবং নির্ঘাত জ্বরে পড়বে। পরশুদিন ফোনে কথা বলার সময় ও ঘং ঘং করে কাশছিল। অতএব অফিস পালিয়ে ওর কলেজের চারপাশে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়ায় চক্কর মেরে বেড়াতে লাগলাম। কলেজ থেকে বেরুনো অন্যান্য মেয়েরা এবং হয়তো পথচারীরাও ভাবল যে, আমার উদ্দেশ্য শুভ নয়। ওরা কী করে জানবে যে, ওদের

মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা যে, তার সম্বন্ধেও আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই। আমি কেবল আমার নয়নার খোঁজে এসেছি। পাছে সে বৃষ্টিতে ভেজে, পাছে তার কষ্ট হয়, পাছে ভীষণ ভিড়ের বাসে তার সুন্দর পায়ের পাতা কোনও বদখত লোক কাদাসুদ্ধ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয়— আমি তাই অফিস পালিয়ে পাগলের মতো কুড়ি মিনিট হল দণ্ডি কাটছি। আমার ভাগ্যদেবীর হাতে দণ্ডিত হচ্ছি। সেদিন দেখা হয়নি নয়নার সঙ্গে। কারণ ওর ক্লাস সেদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আরেক দিনের কথা মনে পড়ল। পাইপটা ধরালাম। কিছু খেলে হয়। মার খেয়ে বেশ খিদে পেয়েছে। একটা হ্যামবার্গার নিলাম।

একবার নয়নার সামান্য জ্বর হয়েছিল। অফিস থেকে ফিরে রোজ ওকে দেখতে যেতাম। বেণি এলিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ও শুয়ে থাকত। গেলে ও খুশি হত। কিন্তু তার চেয়ে আমি খুশি হতাম অনেক বেশি। বোধহয় ওকে আমার নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসি বলে, ওকে অসুস্থ, অসহায় দেখলে আমার ভাল লাগত। মনে হত, ওর জন্যে কিছু করি। ওর কাছে বসে ওকে একটু ভাললাগা দিয়ে, নিজে সার্থক হতাম। ভাবতাম, ওর জন্য কিছু করার একটি সুযোগ মিলল।

ওকে অনেকদিন বলতাম আমি— তোমার বেশ বড় কোনও অসুখ হোক। তোমার যাতে অনেকদিন নার্সিং হোমে থাকতে হয়। অনেকদিন। প্রথম প্রথম আত্মীয়স্বজন, তোমার দেখানো-হিতাকাঙ্ক্ষীরা, বন্ধু-বান্ধবেরা খুব ভিড় করবে। তোমায় দু'বেলা দেখতে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে কেউ আর সময় করে উঠতে পারবে না। সকলেরই কিছু-না-কিছু জরুরি কাজ পড়ে যাবে। এমনকী সুজয় পর্যন্ত তোমাকে দেখতে আসার সময় করে উঠতে পারবে না। তখন আমি প্রতি সন্ধ্যায় অফিস-ফেরতা তোমার কাছে যাব। তোমার কেবিনে বসে থাকব। রোজ তোমার জন্যে ফুল নিয়ে যাব। মাঝে মাঝে ক্যাডবেরিও নিয়ে যাব নার্সকে লুকিয়ে, ভেঙে-ভেঙে, টুকরো করে তোমার ঠোঁটে দেব। তোমাকে একটুও বিরক্ত করব না। কিচ্ছু করব না— শুধু তোমার ঘামে-ভেজা গরম দু'খানি হাতে হাত রেখে, তোমার শুকতারার মতো চোখে চোখ রেখে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকব। তোমাকে যদি সবাই কোনওদিন ত্যাগ করে— সবাই তোমাকে ভুল বোঝে— একমাত্র সেদিনই তুমি জানতে পারবে আমি তোমার জন্য কতটুকু করতে পারি। আমি তোমার কে।

এরকম গড়গড় করে পাগলের মতো বলতাম, একটু থামতাম, একটু ভাবতাম; আর নয়না কনুইয়ে ভর-করা হাতের পাতায় মুখ রেখে বড় বড় চোখ মেলে উৎসুক হয়ে শুনত— তারপর অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায়, যেন এতক্ষণ কিছুই শোনেনি— এমনিভাবে বলত— ইস। কল্পনাও করতে পারেন আপনি। একটি জলজ্যান্ত মেয়েকে মাসের পর মাস নার্সিংহোমে শুইয়ে রাখবেন— কেবল আপনি আমার কে তা বোঝাবার জন্য? সত্যি! আপনাকে নিয়ে চলে না। আপনার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জানি না, হয়তো তাই গেছে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শিশুর কাছে মা'র স্তনের মতো, প্রথম কৈশোরের নিশ্বাসের মতো, প্রথম যৌবনের স্বপ্নভরা আম্রমুকুলিত দিনগুলোর মতো নয়না আমার অন্তরের অংশ হয়ে উঠেছে। ও যে সত্যি আমার কে, তা ওকে কোনওদিনই আমি বোঝাতে পারব না। ও কোনওদিন বুঝতে চায়ওনি— চাইবেও না।

অথচ এইটুকু সহজ অঙ্ক কখনও আমার মাথায় ঢোকে না। কানা ষাঁড়ের মতো কেবলই আমি লাল-কাপড়ের দিকে ছুটে যাই— আর কোনও তরুণ, দৃঢ় মাতাদোরের মতো নয়না আমাকে প্রতিবারই ওর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ছোরা দিয়ে ক্ষতক্ষিত ও রক্তাক্ত করে তোলে।

জানি না, সত্যি সত্যি আমি কী চাই নয়নার কাছে? ভাল ব্যবহার, এমনকী মৌখিক ভালবাসা তাও সে আমাকে দিয়েছে। সে আমাকে অনেকানেক ব্যাপারে অনুপ্রেরণাও জোগায়। এর জন্যেই— মানে ও যা দিয়েছে তা নিয়েই ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অথচ, তবু আমি সর্বদা ছটফটিয়ে মরি। তা হলে কি শরীর— আমি কি তা হলে শরীরটাকেই চাই? তার রজনীগন্ধার মতো প্রস্ফুটিত ছিপছিপে শরীরটাই কি চাই তা হলে?

পাইপের টোব্যাকোটা তেতো তেতো লাগতে লাগল। থুথু ফেললাম অ্যাশট্রেতে। নীতীশের মুখে ফেললে ভাল হত। কোনওরকমে নয়নার উপর প্রতিশোধ নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এ যদি শুধু শরীরই হয় তবে এত ব্যথা কীসের? এত যন্ত্রণা কীসের? যৌবনের সোনার সময়কে এমনি করে মোমের মতো বিনা প্রয়োজনে ক্ষয় করাই বা কীসের জন্য?

কিন্তু ভয় করতে লাগল। শুনেছি, ছোটবেলা থেকে শুনেছি যে এই পাড়া, এদিক-ওদিক গলি-ঘুঁচি, আলো-অন্ধকার সব কিছুই অর্থবাহী। পয়সা থাকলে নাকি পাওয়া যায় না এমন আনন্দ নেই কলকাতায়।

গাড়িটা ওখানেই থাকল। চোরের মতো, লাথি-খাওয়া ঘেয়ো-কুকুরের মতো প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, লেজ গুটিয়ে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট ধরে পা-টিপে পা-টিপে হাঁটতে লাগলাম। একটু এগোতেই, একটি বড় ফ্ল্যাট বাড়ির ফটকের সামনে, পানের দোকানের পাশে, একটা শিয়ালে-খাওয়া কইমাছের চেহারার লোক সোজা আমার চোখের মণি লক্ষ্য করে তাকাল। আমার কান গরম হয়েছিল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ছিলাম। মাথা নোয়ালাম। লোকটা পচা-মাংস-চিবানো হায়নার মতো দাঁত বের করে হাসল, হাত তুলে সেলাম করল, ফিসফিস করে বলল, কেয়া চাহিয়ে সাহাব? পাঞ্জাবি, পারসি, অ্যাংলো, যো কহিয়েগা। ইকদম বেহেতরিন চিজ।

আমি উত্তরে বেশ কেটে কেটে বললাম, মুঝে বাঙ্গালি লা-দো। বলেই, নয়নার চেহারার হুবহু বর্ণনা দিলাম— ওকে একটু অন্ধকারে টেনে দিয়ে।

ও বলল, আপ বেফিক্কর রহিয়ে— জেরা টাইমকা বাত হ্যায়— মগর ম্যায় লায়গা জরুর।

এর আগে আমার মতো আনাড়ি মুরগি এই ধানখেতে কখনও যে ধান খায়নি, তা ওর চোখ দেখেই বুঝলাম।

লোকটা আমায় ভিতরের চত্বরে একটু হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সোফা-সাজানো ঘরে বসাল। সে ঘরের দেওয়ালময় উগ্র অঙ্গভঙ্গিমায় নানারকম মেয়েদের "আয়-না-দেখি" গোছের ছবি।

লোকটি বলল, ম্যায় চলে হুজুর। মগর পঁচাশ রুপেয়া লাগেগা।

আমি বললাম, রুপেয়াকা ফিক্কর মত করো।

ওই ঘরে বসে বসে একা আমার ভয় করতে লাগল। যদি কোনও চেনা লোক দেখে ফেলে? যদি বলে, আরে ঋজু? এখানে কী করছ? যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি কেউ একান্ত দেখে ফেলেই, তা হলে কাটা-ঠোঁট দেখিয়ে, মার-খাবার দাগ দেখিয়ে বলব— তাকে বলব যে, দ্যাখো আমার নয়না আমাকে কী করেছে। তাই তার উপর আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস, যে-কেউ আমার কথা বুঝবে।

তারপর কতক্ষণ সময় কেটে গেল জানি না। একটা গুন্ডা প্রকৃতির লোক— বেঁটে-সেঁটে তেল-চুকচুকে কালো— এসে বলল, রুপেয়া অ্যাডভান্স দিজিয়ে— কামরাকা কেরায়া দিজিয়ে। হাম দোনোকো বকশিশ দিজিয়ে। তারপর শুধোল, মামুলি কামরা লিজিয়েগা, না এয়ার-কন্ডিশনড? কেউ ভেজিটারিয়ান না নন-ভেজিটারিয়ান শুধোলে যেমনভাবে উত্তর দিই, তেমন করে বললাম, এয়ার-কন্ডিশনড। আলবত এয়ার-কন্ডিশনড। এই কলকাতার ধুঁয়ো-কালিতে আমি আমার নয়নাসোনার সঙ্গে মিলিত হতে পারব না। তার সঙ্গে আমি এই প্রথমবার মিলিত হব— শুধু তাই বা কেন? জীবনে এই প্রথমবার কোনও নারীর সঙ্গে মিলিত হব। তা ছাড়া জীবনের এসব স্মরণীয় দিনগুলোতে কার্পণ্য যে করব না, তা ছোটবেলা থেকেই ভেবে এসেছি।

আজকে নয়নার সমস্ত গর্ব আমি ভেঙে দেব। ও আমাকে যত ব্যথা দিয়েছে, সব ব্যথা আমি সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব। আমার অনভ্যস্ত ও অনিয়ন্ত্রিত আরতিতে নয়নার ধূপের গন্ধের মতো আর্তি আমি তিল তিল করে উপভোগ করব।

সেই গুন্ডাটা হিসাব-নিকাশ করে আমার কাছ থেকে সবসুদ্ধ একশো কুড়ি টাকা নিয়ে নিল। বলল, সাব, হুইস্কি-উইস্কি কুছ নেহি পিজিয়েগা?

আমি বললাম, কুছ নেহি।

ও চলে গেল। আমার ঠোঁট থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। আমার নিজের নোনা রক্ত আমি চেটে চেটে খাচ্ছি— সমস্ত শরীরের রক্ত এখন টগবগিয়ে ফুটছে—। নেশায় আমি এখন আলাউদ্দিন খাঁ-র সরোদের মতো বাজছি। তোমরা এখন শুধু আমার নয়নাকে নিয়ে এসো।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। সেই গুন্ডামতো লোকটির সঙ্গে একটি ছিপছিপে অল্পবয়সি মেয়ে ঘরে ঢুকল। অবাক হলাম। বেশ দেখতে তো। কে বলবে যে, মাত্র

পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এ কোহিনুর হিরে বিকোবে। কিন্তু গায়ের রংটা অসম্ভব ফরসা। ঠিক নীতীশের মতো। হ্যাঁ— নীতীশ সেনের মতো ফরসা।

মেয়েটি কাছে এল। ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় উদবেড়ালের চৌবাচ্চায় সিংগি মাছ ফেলে যেমন চোখে আমরা চেয়ে থাকতাম— ভাবটা, কী করে গিলে ফেলে, দেখি—মেয়েটি তেমন চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমরাও যেমন বুঝতাম না, লেজের দিকে আগে কামড়াবে না মাথার দিকে, তেমনি অবুঝের মতো না-বুঝে মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। তারপর বলল, চলুন, ঘরে যাই।

এবার উজ্জ্বল আলোয় মেয়েটির মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। কই? সে চোখ কই? যে চোখে চাইলে আমার সমস্ত সত্তা জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে, ভাল লাগায় আমি সজনে ফুলের মতো কাঁপতে থাকি, সে চোখ কই? এ তো চোখ নয়, যেন মরা ভেটকির কোল। এ চোখে চাওয়া যায় না। এ শরীরে যাওয়া যায় না। এ তো আমার নয়না নয়, এ কাকে এরা এনে দিল আমায়? এর শুধু গড়নই নয়নার মতো, এমনকী, বুক চিবুক সবকিছু— কিন্তু আর কিছুই যে নয়নার মতো নয়। সেই বুদ্ধি কই? সেই দুষ্টুমিভরা হাসি কই? এ আমার নয়না নয়। আমি যে কেবল নয়নাকেই চেয়েছিলাম— তার সব কিছু মিলিয়ে আমি যে একমাত্র তাকেই চেয়েছিলাম। আমার তো অভিমান শুধু নয়নার উপরে, পৃথিবীর অন্য কোনও মেয়ের উপর তো আমি প্রতিশোধ নিতে চাইনি। আমি কেবল তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম; বোঝাতে চেয়েছিলাম; কী যে বোঝাতে চেয়েছিলাম তা আমি নিজেও জানি না।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি অবাক চোখে তাকাল। এমন উদবেড়াল সে জীবনে দেখেনি। বলল, কী হল? আমি বুঝি দেখতে খারাপ?

আমি বললাম, তাড়াতাড়িতে, ভয় পেয়ে তোতলাচ্ছিলাম, বললাম— তা নয়, তা নয়, এখানে আমি একজনকে খুঁজতে এসেছিলাম ভাই। তাকে পেলাম না।

মেয়েটি আরও অবাক হল। বলল, সে কী? কে সে? নাম কী? মিলি?

আমি বললাম, না। অন্য একজন। সে হারিয়ে গেছে।

এবার মেয়েটির মুখ সম্পূর্ণ বদলে গেল, কী এক কান্না-কান্না, নিষ্পাপ ভাব তার প্রসাধিত মুখে ছড়িয়ে গেল—উদ্‌বিগ্ন গলায় শুধাল, পাকিস্তানে বুঝি দেশ ছিল?

বললাম, না। শিলঙের এক গুন্ডা তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর খুঁজে পাচ্ছি না। চলি। বলেই ঘর ছেড়ে চত্বরে নামলাম। মেয়েটা দরজা থেকেই বলল, শুনছেন; এই যে শুনছেন—

আর পেছন ফিরে তাকালাম না। আমার ভীষণ কান্না পেতে লাগল। নিজের জন্যে। নয়নার জন্যে। এবং নাম-না-জানা এই মেয়েটির জন্যেও।

সোজা ক্লাবে এলাম।

আমি ভীরু নই। কার সঙ্গে লড়তে হবে জানলে আমি লড়তে পারি কি না দেখাতাম। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজে আমি লড়তে শিখিনি কোনওদিন। পারি না। নয়না কোনওদিন আমাকে একবারের জন্যেও বলেনি কী করলে আমি ওর যোগ্য

হতে পারি। নীতীশ যে কেন এবং কী বাবদে আমার চেয়ে ভাল, এ কথার জবাব কোনওদিন জানতে পাব না। হয়তো অনেক প্রশ্ন আছে যার জবাব কেউ দেয় না। যার জবাব কালের স্রোতে, জোয়ারে-ভাসা কুটোর মতো হয়তো এমনিই ভেসে আসে। ভালবাসলে কী করতে হয় আমি জানি না। নয়নাও একদিন বলেছিল, জানে না। কেউ জানে কি, তাও জানি না।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার আর কোনও ইচ্ছে নেই। নয়নার মুখটা শুধু আমার চেতনা থেকে, আমার অবচেতন থেকে মুছে ফেলতে চাই। তার প্রশান্ত কপাল, তার উজ্জ্বল চোখ দুটি আমি যেন আর্তনাদ করেও, সমস্ত রকমে চেষ্টা করেও, কখনও মনে না আনতে পারি। কোনওদিন কোনওদিন, কোনওদিন মনে না আনতে পারি।

হুইস্কি লাও। বেয়ারা, হুইস্কি লাও।

১৪

লাইট-হাউসের সামনের বইয়ের দোকানে বই দেখছিলাম। দুটো বই অর্ডার দেওয়া ছিল। ওরা সে দুটো প্যাক করে দিচ্ছিল। বই দুটি নিতেই এসেছিলাম।

আজ শনিবার। এখন চারটে বাজে। অফিস থেকে বেরিয়ে এই এসেছি। বইগুলো নাড়ছি-চাড়ছি। এমন সময় আমার বাহুতে আঙুল ছুঁইয়ে কে যেন বলল, এই!

ঘাড় ফেরাতেই দেখি নয়না।

প্রথমে ঠিক করলাম, কথাই বলব না। কিন্তু নিজের অজান্তেই পরক্ষণেই আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললাম, কী?

অসভ্য।

অসভ্য কেন?

কতদিন আসেন না বলুন তো। কত বছর?

বললাম, বছর তো নয়, দুয়েক মাস মাত্র। এমনিতেই যাই না। বড় হবার চেষ্টা করছি। তা ছাড়া গেলে তোমার পড়াশুনার অসুবিধে হয়।

বুঝলাম। কিন্তু ফোন করলেও কি অসুবিধে হত?

একটু শক্ত গলায় বললাম, হত বই কী। ওই একই অসুবিধে হত।

আমার গলার স্বর শুনে ও আমার চোখে চোখ মেলে সম্পূর্ণভাবে চাইল— তারপর মুখ নিচু করে বলল, আপনার দেরি হবে? আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

ভাবলাম বলি যে, তুমি যেতে পারো। তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই! থাকবেও না কোনওদিন।

কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারলাম না। নয়না যদি এ জীবনে কখনও কোনও সময়ে, এমনকী যখন আমার ভুরু সাদা হয়ে যাবে, চুল ধবধব করবে, তখনও যদি কখনও আমার চোখে তাকিয়ে বলে, ঋজুদা, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল—

তখনও আমার সব কাজ ফেলে আমাকে ওর কথা শুনতে হবে। কারণ It is my destiny. পূর্বজন্মের কোনও অজানা ঋণের বোঝা আজীবন আমায় শোধ করতে হবে নয়নার কাছে। শোধ করতেই হবে। আমার মুক্তি নেই।

বললাম, একটু দাঁড়াও। দুটি বই অর্ডার দিয়েছিলাম। বেঁধে দিচ্ছে।

ও ঘাড় হেলিয়ে বলল, আচ্ছা!

অনেকদিন পরে নয়নাকে দেখলাম। এতদিন ওকে বড় দেখতে ইচ্ছে করেছে— বড় কথা বলতে ইচ্ছে করেছে ওর সঙ্গে। তবু, খাঁচায়-বন্ধ বাঘের মতো লোহার শিকে আছড়ে, মাথা কপাল রক্তাক্ত করেছি। তবু ওর সঙ্গে দেখা করিনি, বা কথা বলিনি। যদি কেউ আমার মতো করে কখনও কাউকে ভালবেসে থাকে তবে কেবলমাত্র সে-ই বুঝতে পারবে— এতদিন পর নয়নাসোনাকে দেখে আমার কতখানি ভাল লাগছিল। এই শীত-শেষের বিকেলে বড় ভাল লাগছে। একটা চাঁপারঙা কার্ডিগান পরেছে নয়না, চাঁপারঙা কাশ্মীরি সিল্কের শাড়ির উপর। অনেকদিন পরে দেখছি বলে কি না জানি না মনে হচ্ছে এ ক'মাসে ও যেন অনেক বড় ও আরও অনেক বেশি সুন্দরী হয়ে গেছে। আরও অনেক বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

বললাম, তুমি এখানে কী করছিলে?

আমি? এই একটু কেনাকাটা করতে মার্কেটে এসেছিলাম।

বইটা নিয়ে বললাম, বলো কোথায় যাবে।

আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

মনে হচ্ছে ফাঁসির আসামির ইচ্ছাপূরণের মতো আজ তুমিও আমার ইচ্ছাপূরণে বদ্ধপরিকর।

যা বলুন।

তোমার হাতে সময় আছে তো?

আছে। রাত এগারোটা অবধি। ছ'টার শোতে সুমিতা সিনেমার টিকিট কেটেছিল। রাতে ওদের বাড়ি খাওয়ার নেমন্তন্নও ছিল। একটু আগে জানলাম, মানে বাড়ি থেকে বেরুনোর পর, যে দু'টোই ক্যানসেল। সুমিতার এক মামার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে— তাই। অথচ বাড়িতে বলে এসেছি। তাই এগারোটা অবধি চিন্তা করবে না কেউ।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ফেরাজিনিতে এসে বসলাম। গাড়ি রেখেছিলাম লাইট-হাউসের সামনে। গাড়ি ওখানেই থাকল। কোণের একটি টেবলে— দু'জনে বসলাম। আজ বহুদিন বাদে নয়না আমার সঙ্গে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ওর হাতে— ঝোলানো কালো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটি ছোট প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিল।

অবাক হয়ে শুধোলাম, কী?

আপনার জন্যে দুটি টাই ও দুটি মোজা কিনেছিলাম।

রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়লাম। বললাম, কেন? কী ব্যাপার?

ও হাসল। বলল, ব্যাপার কিছু নয়। অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল, আমাকে যে

আপনি স্নেহ করেন তার স্বীকৃতি হিসেবে, যেদিন নিজে রোজগার করব, সেদিন আপনাকে কিছু কিনে দেব।

এই 'স্নেহ' কথাটাকে আমি ঘেন্না করি— আমি ওকে কোনওদিন ছোটবোনের মতো ভালবাসতে পারিনি— চাইনি— আজও চাই না— অথচ ও সব সময় আমাকে শ্রদ্ধা দেখায়, দাদার মতো দেখে।

বললাম, তুমি চাকরি আরম্ভ করে দিয়েছ নাকি?

না! একটি বাটিকের শাড়ি বানিয়েছিলাম। তার সম্মানী পেয়েছি ষাট টাকা।

আর সেই টাকার প্রায় সবটাই খরচ করে ফেললে একটা লোকের জন্যে যে তোমাকে কেবল জ্বালালই চিরদিন।

নয়না চোখ তুলে বলল, আপনি ভীষণ খারাপ। অমন করে বলবেন না। আমার ভাল লাগে না।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেল।

আমি বললাম, তারপর? তোমার কী খবর বলো? নীতীশ সেন কেমন আছে?

নয়না আমার চোখে একবার চাইল। যেন ও বলতে চাইল— নীতীশকে আমার এত অপছন্দ কেন?

ও কিছু বলার আগেই— ওই নামটা উচ্চারণ করতেই জ্ঞানত আমার গলার স্বরটা সম্পূর্ণ বদলে গেল— মাথায় আবার সেদিনকার সেই যন্ত্রণাটা, যেদিন এক কল্পিত নয়নার উপর আমার সমস্ত ইচ্ছা আরোপ করার দুরাশায় একটা ঘৃণিত অভিজ্ঞতার চৌকাঠে পা দিয়ে ফিরে এসেছিলাম, সেটা ফিরে এল।

নয়না ঠান্ডা গলায় চোখ নিচু করে বলল, নীতীশদা ভালই আছে—কলকাতা আসছে আবার সামনের দোলে। আপনি বোধহয় জানেন না, নীতীশদার বিয়ে হয়ে গেছে। অবশ্য বেশিদিনের কথা নয়। এই তো দিন পনেরো আগে ওরা শিলং ফিরল।

নাঃ, আজকেও নয়না দেখছি আমায় হারিয়ে দেবে।

আমি খুব ঠান্ডা গলায় আমার সমস্ত উত্তাপ ঢেকে বললাম, শুনিনি তো! কোথায় বিয়ে করল?

নিজেই পছন্দ করে করেছে।

খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি?

খুব না হলেও বেশ বড়লোকের মেয়ে। বেশ সুন্দরী। নীতীশদা যে কোম্পানিতে কাজ করে সে কোম্পানির একজন ডিরেক্টরের মেয়ে। বিয়ে অবশ্য কলকাতাতেই হয়েছিল, বরযাত্রী যেতে বলেছিল আমাকে।

তুমি গেছিলে নাকি?

বাঃ নেমন্তন্ন করল, যাব না? গিয়েছিলাম।

ঘরের কোনায় নিচু গ্রামে বাজনা বাজছিল। চাঁপারঙা পোশাকে সেই প্রায়ান্ধকারে নয়নাকে কোনও জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার বিশীর্ণা শুকনো চাঁপাফুল বলে মনে হচ্ছিল। কৃশাঙ্গী, সুগন্ধি, তেজস্বিনী, করুণ কোনও ক্যাথলিক নান-এর মতো। এতদিন ওর

চোখে চেয়ে ওর চোখের পাতায় চুমু খেতে ইচ্ছে করেছে— আজ হঠাৎ মনে হল ওর চোখেমুখে কোথাও কোনও দেবীমহিমা আরোপিত হয়ে গেছে, যা আগে কখনও লক্ষ করিনি।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম।

আমি ভেবেছিলাম, মানে একটু আগেও ভাবছিলাম যে, আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মহত্যা করাতে আমি ওয়াকওভার পেয়ে যাব। এবার আমি আমার জয়ধ্বজা ওড়াব, সেলিব্রেট করব, কিন্তু নয়নার মুখে চেয়ে আমি ওসব কথা আর ভাবতে পাচ্ছি না। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, এখন নয়নার বুকের ভিতর কী হচ্ছে। অথচ বাইরে তার আভাসমাত্র পৌঁছোচ্ছে না।

বললাম, নীতীশ বেশ ভাল ছেলে।

কেন বললাম জানি না।

নয়না বলল, নিশ্চয়ই। খুব ভাল ছেলে।

ও তো বলবেই—। ও যে ভালবাসে— মানে ভালবাসত। আর কেউ না বুঝুক আমি তো ওকে বুঝতে পারি। শালা নীতীশ। এই নাকি ভাল ছেলে। একটা মেয়ে, যে কোমল স্বর্ণলতার মতো একটা সজীব সবুজ মনোমত গাছকে আঁকড়ে মনে মনে লতিয়ে উঠেছিল সকালের সোনালি আলোয়, তাকে কিনা সে নিজে হাতে নিষ্ঠুরের মতো আঁকশি দিয়ে নিড়িয়ে দিল একটানে। ছিঁড়ে ফেলে দিল। তবুও নয়না বলবে, নীতীশ ভাল ছেলে। এসব ছেলেকে মড়িতে-হাজির বাঘের ঘাড়ে মাচা থেকে ফেলে দিতে হয়। অবশ্য নয়নার কদর ও কী করে বুঝবে? ওর তো শুধু টাকা আছে। শুধু টাকা দিয়ে ভাল ইলিশ মাছ কেনা যায়, কিন্তু ভালবাসা চেনা যায় না। যে ছেলে বড়লোকের পিয়ানো-বাজানো গিমলেট-গেলা কোনও ইনসিপিড মেয়ের বিনিময়ে নয়নার মতো মেয়েকে হারাল— সে আজীবন পা ছড়িয়ে বসে কাঁদবে। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

কতক্ষণ চুপচাপ করে কাটল জানি না। বোধহয় অনেকক্ষণ। নয়না পেয়ালায় চা ঢালছিল। বাঁ হাতে একটি মাত্র কাঁকন পরেছে। কার্ডিগানটির হাতাটি গুটিয়ে তুলে নিয়েছে। ডান হাতে রিস্টওয়াচ। ওর স্বপ্নিল আঙুলে ও চামচে ধরে সুগারকিউব, পেয়ালায় ফেলে চিনি মিশোচ্ছে। অর্কেস্ট্রাতে বেলাফন্টের গান বাজাচ্ছে ওরা। নিচু গ্রামে—। মনে হচ্ছে কোনও একটা দমবন্ধ যন্ত্রণা কোনও গভীর শীতল পাতকুয়ো থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসছে। নয়নার চোখের দিকে চাইতে পারছি না।

সত্যি কথা বলতে কী, এক মুহূর্ত আগেও আমি যা কল্পনাও করতে পারিনি— নয়নার হেলানো বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে হঠাৎ আমার তাই মনে হল। নীতীশ নয়নাকে বিয়ে করলে আমি সবচেয়ে সুখী হতাম। নিজের মাথার চুল হয়তো টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম—হয়তো শট-গানের মাজল গলায় ঠেকিয়ে পা দিয়ে ঘোড়া টেনে দিতাম— কিন্তু তবু, আমি হয়তো এখনকার চেয়ে সুখী হতাম।

নয়নাকে যে ঠিক এতখানি ভালবাসি তা একটু আগেও আমি বুঝতে পারিনি। পরম কামনায় কঁকিয়ে-কেঁদেও যে যন্ত্রণা পাইনি— আজ নয়নার ব্যথায়-ভরা চোখে চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা পেতে লাগলাম। নয়নার দিকে তাকাতে পারলাম না।

ফেরাজিনি থেকে বেরিয়ে, নয়না যেন কেমন হঠাৎ প্রগল্‌ভা, সস্তা হয়ে গেল। ও যা কোনওদিন ছিল না, ও তাই হয়ে গেল। গাড়িতে আমার খুব কাছ ঘেঁষে বসল। আমার বাঁ কাঁধে দু'-দু'বার মাথা নুইয়ে রাখল।

বললাম, কী হল সোনা?

নয়না ফিসফিস করে বলল, আপনার চিঠিগুলোর কথা ভাবছিলাম। এত সুন্দর চিঠি লেখেন কী করে আপনি?

বললাম, সকলকে লিখতে পারি না। তুমি তো সে কথা জানো যে, চিঠি লিখিয়ে নেবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। চিঠি লেখবার ক্ষমতার চেয়ে চিঠি লিখিয়ে নেবার ক্ষমতা অনেক বড়। সে ক্ষমতা তোমার আছে। তাই হয়তো তোমাকে ভাল চিঠি লিখতে পারি।

ও অস্ফুটে বলল, জানি না।

বললাম, এবার কোথায়?

ও বলল, আমি জানি না। আমার এগারোটা অবধি ছুটি— আপনি আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যান—।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গাড়ি রেখে দু'জনে নামলাম। বললাম, চলো একটু হাঁটি—তারপর ফিরপোয় গিয়ে ডিনার খেয়ে সকাল সকাল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

শেষ শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশায় বাতিগুলো গলে গলে পড়ছে। নুড়িগুলো ভিজে রয়েছে। নয়না হয়তো স্বপ্ন দেখছে। ঠিক আমি যেমন করে দেখি। এই শীতের সন্ধ্যার কুয়াশা ওর চোখ থেকে মুছে গিয়ে শিলঙের পাইন-ভরা হেঁয়ালি-মাখা সন্ধ্যা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। লাইটমুকরার কোনও পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট কটেজ। ভিতরে গোলাপি ল্যাম্পশেডে আলো জ্বলছে— পেলমেট থেকে ভারী সুন্দর সুন্দর পরদা ঝুলছে জানলায় জানলায়। নীতীশ বোধহয় এখুনি অফিস থেকে ফিরল। মুখ-হাত ধুয়েছে। ওরা ছোট্ট খাবার ঘরে দু'জনে চা খেতে বসল। নয়না চিংড়ির কাটলেট বানিয়েছে— গরম গরম। বলল, তোমাকে একটু চিলি সস দিই? নীতীশ বলল, দাও; একটু দিয়ো।

আদরে টি-কোজির গায়ে হাত দিয়ে, কেটলি থেকে তুলে নয়না চা বানাল, চা ঢেলে দিল। সুরেলা রাত গড়িয়ে চলল।

এমন সময় একটি রবারের বল এসে নয়নার গায়ে লাগল। আমার অথবা নয়নার স্বপ্ন ভেঙে গেল। একটি দুরন্ত দুষ্টু গাবলু-গুবলু তিন বছরের ছেলে সুন্দর কালো সার্জের পোশাক পরে দৌড়ে এসে নয়নাকে বলল, আমার বল দাও। নয়না বলটি

নিজে হাতে তুলে দিল। তারপরে ছেলেটির দিকে তাকাল। ধবধবে ফরসা ছেলেটি। নীতীশের মতো ফরসা। নয়নার সমস্ত স্বপ্ন ধীরে ধীরে কোনও জাপানি চিত্রকরের ওয়াশের কাজের মতো একটা হালকা এক-রঙা অপস্রিয়মাণ ছবিতে গড়িয়ে গেল। সব মুছে গেল। কিছুই আর বাকি রইল না।

অনেকক্ষণ আমরা হাঁটলাম। নয়নার হাবভাব দেখে আমার ভাল মনে হচ্ছিল না। এখন ও একেবারে চুপ করে ছিল। সেখান থেকে বাইরে এলাম। তারপর আটটা নাগাদ ফিরপোতে এসে একটি ছোট টেবিলে বসলাম।

হাত দিয়ে টেবল-ক্লথটা সমান করতে করতে নয়না বলল, আচ্ছা ঋজুদা, খাওয়ার পর আমরা কোথায় যাব?

কেন? বাড়ি! তুমি অন্য কোথাও যেতে চাও?

না। মানে, না। কিচ্ছু না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বেয়ারা সুপ দিয়ে গেল। সুপ খেতে খেতে নয়না বলল, ঠান্ডাটা বেশ প্লেজেন্ট লাগছে, না?

হুঁ।

আপনাকে এই সুটটা পরে কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, ঋজুদা।

তাই বুঝি? কাপড়টা তো তুমিই পছন্দ করে দিয়েছিলে, মনে নেই?

হ্যাঁ। মনে আছে।

বললাম, নয়না, তোমার কাছে আমার যে চিঠিগুলো আছে, সেগুলো এক জায়গা করে রেখো। আমি একদিন গিয়ে নিয়ে আসব।

নয়নার চোখ দুটি জ্বলে উঠল। বলল, কেন? ও চিঠিতে আপনার কী অধিকার? ও চিঠি তো আমার চিঠি।

বললাম, তা ঠিক। কিন্তু এগুলো আমার মনের অসংবদ্ধ প্রলাপ ছাড়া আর তো কিছুই নয়— আমার ডাইরিও বলতে পারো। তা ছাড়া চিঠিগুলোর দাম যখন কিছুই নেই।

ও উত্তেজিত গলায় বাধা দিয়ে বলল, অনেক দাম, অনেক দাম। আপনি কী বুঝবেন? দাম ফেরত দিতে পারি না বলে কি দাম বুঝতেও পারি না ঋজুদা! আমাকে এত হীন ভাবেন কেন?

এরপর আর কোনও কথা চলে না।

পুডিঙের প্লেটে চামচ দিয়ে কাটাকুটি করতে করতে নয়না বলল, মনে আছে ঋজুদা, একদিন আমি আপনাকে শুধিয়েছিলাম, ভালবাসলে কী করতে হয়? উত্তরে আপনি বলেছিলেন, জানি না। তখন আমিও বলেছিলাম, আমিও জানি না। অথচ আমরা দু'জনেই জানতাম যে, দু'জনেই মিথ্যা কথা বলছি। বলুন? সত্যি না?

আমি বললাম, হয়তো সত্যি। কিন্তু তাতে কী? সে তো অনেক পুরনো কথা।

নয়না বলল, উঠুন।

চলো।

ফিরপোর গালচে-ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মাঝ বরাবর এসে দু'পাশে ক্যাবারে ড্যান্সারদের ছবি যেখানে আছে, সেখানে নয়না থমকে দাঁড়াল। বলল, ওরাও নিশ্চয়ই কারও না কারও ভালবাসা পেয়েছে। না?

বললাম, হয়তো পেয়েছে।

ও বলল, ইস— ওদেরও কেউ-না-কেউ ভালবাসে, অথচ আমাকে কেউ ভালবাসে না।

আমার ভালবাসাটা ও ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না কোনওদিন, তা ভালভাবে জেনেও সেই মুহূর্তে ওর হাতটা মুঠি করে ধরে বললাম, তোমাকেও অনেকে ভালবাসে। আমিও তোমাকে ভালবাসি। ওদের সঙ্গে তোমার নিজেকে তুলনা করার দরকার কী? তুমি যেন কী হয়ে যাও মাঝে মাঝে।

বলতেই, ধুলো-মাখা চড়াইয়ের মতো ও ফুলে দাঁড়াল; বলল, দরকার নেই? কেন দরকার নেই? আমাকে যে কেউ ভালবাসে না তার প্রমাণ আমি পেয়েছি, কিন্তু আমাকে যে কেউ ভালবাসে তারই প্রমাণ পাইনি।

গাড়িতে উঠে নয়না বলল, গঙ্গার ধারে চলুন। এখনও হাতে অনেক সময় আছে। আপনার সঙ্গে ছিলাম জানলে মা রাগ করবেন না।

গঙ্গার ধারে রাতে বিশেষ লোকজন নেই, দুটো-একটা গাড়ি এখানে-ওখানে পার্ক করানো আছে। জাহাজে আলো জ্বলছে। এখন জোয়ার। কুলকুল করে জল এসে পাড়ে লাগছে।

গাড়িটা একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে দাঁড় করাতেই নয়না সরে এসে আমার গায়ে ঝুঁকে পড়ে অস্বস্তি-ভরা গলায় আমাকে বলল, এই! আপনার হাতটা আমার হাতে রাখুন।

অবাক হলাম।

একদিন আমি ওর হাতটি আমার হাতে ধরতে চেয়েছিলাম। সেদিন ও ঠাট্টা করে বলেছিল, আজ বুঝি বাংলা ছবি দেখে এসেছেন? নইলে এত ঢং কীসের? সেদিন ও বোঝেনি, জানেনি যে, যাকে কেউ সত্যিকারের ভালবাসে তার হাতে হাত রাখার মতো মহৎ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কোনও কথা বললাম না।

আমার বাঁ হাতটি ওর কোলে রাখলাম।

ও ওর দু'হাতের পাতায় আমার হাতটি নিয়ে বসে থাকল। মাথাটি আমার কাঁধে হেলিয়ে রাখল।

পাশ দিয়ে হেডলাইট জ্বেলে একটি গাড়ি গেল।

ভাবলাম, লজ্জা পেয়ে ও এবার সরে বসবে।

কিন্তু পরক্ষণেই একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। নয়না আমার বুকে মাথা

গুজে ফুঁপয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফুলে ফুলে কিন্তু প্রায় নিরুচ্চারে কাঁদতে লাগল।

আমি কী করব জানি না। আমি সাধারণ। যে নয়নাকে আমি আমার অস্তিত্বের সর্বস্বতা দিয়ে, ভিখিরির মতো, কাঙালের মতো এতদিন চেয়ে এসেছি— যাকে ভুলে থাকার চেষ্টায় নিজেকে তিল তিল করে ক্ষইয়ে ফেলেছি— মনোসংযোগ নষ্ট করেছি, শরীর নষ্ট করেছি, আত্মঘাতী আর্তিতে অনুক্ষণ অনন্ত অস্বস্তি পেয়েছি— সেই নয়না আজ আমার বুকে থরথরিয়ে কেঁপে মরছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নভরা কুঠুরির চাবিকাঠি এখন আমার হাতের মুঠোয়।

এখন আমি কী করি?

আমার সাদা জামায় ওর লিপস্টিকের টিপ লেগে একাকার হয়ে গেছে। কপালের টিপটি ধেবড়ে গেছে। রুক্ষ শ্যাম্পু করা চুলগুলো এলোমেলো। নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস বইছে, চোখের পাতা ভেজা। নয়না কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ঋজুদা, আমি একদম ফুরিয়ে গেছি— একদম ফুরিয়ে গেছি ঋজুদা। ওর মতো শান্ত, সংযত স্বল্পবাক বুদ্ধিমতী মেয়ে যে এমন হয়ে যেতে পারে তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

গাড়িটা স্টার্ট করে খুব আস্তে আস্তে চালাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, দোলের আর দেরি নেই। মনে মনে অনেকদিন ভেবেছিলাম, নয়নাকে নিয়ে মণিপুরে একবার দোল-পূর্ণিমায় যাব— ওকে ঝুলন দেখাব। লকটাক হ্রদের পাশে দু'জনে, একেবারে দু'জনে—সঙ্গে আর কাউকে না নিয়ে—পিকনিক করব; থৈবীখাম্বার নাচ দেখব। দোল আসছে। দেখতে দেখতে একটা বছর ঘুরে গেল।

মনে হল, নয়না যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে। সরে বসল। সরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। চুপটি করে। সাদার্ন অ্যাভিনিউতে গাড়িটা দাঁড় করালাম। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলাম ওর দিকে। গাড়ির ভেতরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে ওকে বললাম, নাও তো লক্ষ্মী মেয়ে, মুখটা আর কপালটা ভাল করে মুছে নাও তো। বাড়িতে বলবে কী? ছিঃ ছিঃ। সঙ্গে চিরুনি আনতে ভুলে গেছ বুঝি?

বাচ্চা মেয়ের মতো ও মাথা নাড়ল।

আমি আমার পার্স থেকে বের করে ছোট চিরুনিটা ওকে দিলাম। চুপ করে ও রুমাল দিয়ে চোখ মুছল, মুখ মুছল, চিরুনি দিয়ে কপালে-পড়া চুল আর এলোমেলো অলকগুলোকে ঠিক করে নিল।

হঠাৎ ওর চিবুকে হাত ছুঁইয়ে ওর মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বললাম, দেখি? খুকি হাসো তো একটু?

কান্না-ভেজা চোখে আমার পাগলামিতে ও ফিক করে হেসে উঠল— বলল, অসভ্য কোথাকার!

বললাম, আমি অসভ্য?

বলতেই, ও আবার কাঁদতে লাগল।

আমি বললাম, আবার কাঁদলে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে সারারাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বোকা মেয়ে। এই নাকি তুমি আমার এত গর্বের নয়নাসোনা? একটা বাজে ছেলের কাছে তুমি হেরে যাবে? নীতীশ তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নয়। তোমাকে ব্যথা দিয়েছে বলে বলছি না। সত্যি সত্যিই বলছি। তোমার যোগ্য ছেলে যে নেই তা নয়, অনেক আছে এবং একদিন না একদিন এত বড় কলকাতা শহরে তাদের কারও-না-কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবেই। ইয়াং, হ্যান্ডসাম, বুদ্ধিমান, মদ-খায়-না-একটুও; ঠিক যেমনটি তুমি চাও। শুধু তুমি নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

ওর কান্না-ঝরা চোখের মণিতে ও যেন কোনও নতুন ঋজুদাকে আবিষ্কার করল, যাকে ও কোনওদিন জানেনি— আমিও কি ছাই এই— আমিকে চিনতাম?

নয়নাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। নয়না গাড়ি থেকে নামবার সময় আমার বাঁ হাতটি ওর হাতে নিল। তারপর কান্না-কান্না গলায় বলল, আপনি যদি না আসেন, কিংবা ফোন না করেন, তা হলে ভীষণ খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

বললাম, আসব পাগলি মেয়ে, নিশ্চয়ই আসব। একশো বার ফোন করব।

১৫

ক্লাবে সপ্তাহে তিনদিন বুকিং করেছি। রাতে মার্কারের সঙ্গে প্র্যাকটিস করি। অফিস করি, গরমে পুলোভার পরে টেনিস খেলি, তারপর বাড়ি এসে চান করে ঘুমোই। বন্ধু-বান্ধবেরা আমায় প্রায় অনেকদিন হল ত্যাগ করেছে— এক জঙ্গলের বন্ধুরা ছাড়া। শহরের বন্ধুদের তো কোনও সময়ই দিতে পারি না— তাই ওরাও অনেকদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে, অবশেষে আমায় পুরোপুরি ত্যাগ করেছে। ওদের দোষ দিই না।

আজকে বিয়ান্দ্‌কারের সঙ্গে বাজি ছিল, যদি ও আমাকে হারাতে পারে তো ওকে একদিন লাঞ্চ খাওয়াতে হবে। জিততে পারলাম না। হেরে গেলাম। কবে কোন প্রতিযোগিতাতেই বা জিতেছি? ওর সার্ভিসটা খুব জোরালো আর ব্যাকহ্যান্ডে ক্রসকোর্ট যা মার মারে তা বলার নয়। দারুণ দারুণ মার আছে ওর হাতে।

ভাবলাম, ক্লাবেই চান করে, কিছু খেয়ে, রাত ন'টার শোয়ে কোনও সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরব।

অন্ধকারে হার্ড-কোর্টগুলো পেরোচ্ছি, এমন সময় মনে হল ওপাশ থেকে সুজয় আসছে।

ওকে দেখে বিয়ান্দ্‌কার বলল, হ্যালো চাডরি। হ্যাভন্‌ট সিন ইউ সিন্স এজেস।

সুজয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ইয়া ম্যান, আই ওজ টু বিজি। আই অ্যাম ফ্লাইং দ্য ডে আফটার টুমরো।

জানতাম ও যাচ্ছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে যাচ্ছে জানতাম না। অনেকদিন ওদের বাড়ি যাই না। নয়নার সঙ্গেও দেখা বা কথা হয় না। অতএব জানার সুযোগও হয়নি। অবাক হলাম। একটু লজ্জিতও হলাম।

সুজয় বলল, ঋজু, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

বিয়ান্দ্‌কার, সি ইউ এগেন বলে চলে গেল।

বললাম, কী কথা রে?

ও বলল, সময় লাগবে। চল। লনে গিয়ে বসি।

ক্লাবের লনে বেতের চেয়ার পাতাই ছিল। আমরা গিয়ে বসলাম।

কিছু খাবি?

ও বলল, নাঃ, থ্যাঙ্কস।

ও যেন কেমন ইচ্ছে করে ফর্ম্যাল হয়ে যাচ্ছে। এরকম ও ছিল না।

মনে হল সুজয় এমন কিছু একটা বলবে আমাকে, যার জন্যে আমি মনে মনে প্রস্তুত নই। ওর মুখটা দেখে ও যে আমার কলেজের বন্ধু সুজয়, তা মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ওকে আমি চিনি না। অন্তত, ও আমার বন্ধু নয়।

সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে ও বলল, সোজাসুজিই বলি কথাটা। দ্যাখ ঋজু, অন্য কোনও ছেলে হলে আমি হয়তো কিছু ভাবতাম না, কিন্তু তোর এমন কীর্তি? ভাবতে পারি না।

চমকে উঠলাম আমি।

বললাম, কী কীর্তি?

কী, তা তুই জানিস না! নয়নাকে তুই ভালবেসে চিঠি লিখিস। তোর লজ্জা করে না?

আমি চুপ করে থাকলাম।

ওকে বলতে পারতাম যে ভালবাসি, ব্যস। ওই পর্যন্ত। তার জন্যে আমার নিজের ছাড়া অন্য কোনও ক্ষতিই কারও আমি করিনি। নয়নারও না। কিন্তু ভালবাসি।

এটা অস্বীকার করতে পারি না। ভেবে দেখলাম, এসব কথা সুজয় বুঝবে না। গত তিন-চার বছর হল ওর বন্ধু-বান্ধবের দল সব অন্যরকম হয়ে গেছে। ও আমার কথা বুঝতে পারবে না। বোঝাতে চাইলেও বুঝবে না।

একেবারে বদলে গেছে সুজয়। ও কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। তাই চুপ করেই রইলাম।

ও রেগে গেল। বলল, কী? চুপ করে আছিস যে?

বললাম, কী জানতে চাস বল?

জানবার কিছু তো বাকি নেই। তোর জন্যে নীতীশ নয়নাকে রিফিউজ করেছে। তুই আমাদের পরিবারের শনি। আমার পরিচয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে কি তুই আমাদের এই উপকার করলি? নীতীশকে তুই কী বলেছিস নয়নার নামে, বল!

বললাম, কিছুই বলিনি।

ও ধমকে বলল, মিথ্যা কথা।

অনেকদিন আমি অত রেগে যাইনি। আমার সারা গা থরথর করে কাঁপতে লাগল, বললাম, তুই আমার কাছে মার খাবি সুজয়। ভদ্রভাবে ও বুঝে-সুঝে কথা বল।

ও বেশ চেঁচিয়ে বলল, তা হলে কি তুই বলতে চাস, নয়না খারাপ? আমার বোনই খারাপ?

বললাম, তোর বোন খারাপ নয়। তোর চেয়ে অন্তত অনেক ভাল।

সুজয় বলল, দ্যাখ ঋজু, তোর কাছে আমি তত্ত্বকথা শুনতে আসিনি। তোর সঙ্গে কথা বলাও বৃথা। তুই একটা ইডিয়ট। ফার্স্টক্লাস ইডিয়ট। একটা কথা শোনো, আমি কলকাতা থেকে যাবার আগে তোমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে আমায়।

কীসের কথা?

তুমি আমাদের বাড়ি যাবে না, আমাদের বাড়ি ফোন করবে না এবং আমার বোনকে চিঠি লিখবে না। যদি তুমি এ কথা না দাও, তা হলে খারাপ হবে।

খারাপ হবে মানে?

মানে, অনেক কিছু হতে পারে।

কী ভাবে সুজয়টা আমাকে? কী ভাবে ও? তখন আমার রাগ আর নেই। দুঃখে, অপমানে, নয়নার উপর অভিমানে, আমার তখন কান্না পাচ্ছিল।

সুজয় বলল, তুই জানিস? তোর চিঠি নয়না সকলকে পড়ায়? টেবিলের উপর রেখে দেয়, খোলা-ড্রয়ারে রাখে। যে আসে সেই পড়ে। তোকেও আমি ভালবাসি ঋজু। অন্তত ভালবাসতাম। এতে তোর জন্যেও কষ্ট হয়। তোর কি মানসম্মান বলে কিছুই নেই? ও আমার বোন হোক আর যেই হোক, ও কী এমন মেয়ে যে, তুই ওর পায়ে চুমু খেতে চাইবি, পা ধরতে চাইবি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তোর কি মানসম্মানবোধ সব লোপ পেয়ে গেছে? তোর জন্যে আমার মাথা কাটা যায়। এটুকু তুই জানিস যে, নয়না তোকে ভালবাসে না, কোনওদিন ভালবাসেনি। বাসবেও না কোনওদিন।

চুপ করে রইলাম।

কী? কথা বলছিস না যে?

বললাম, জানি তা।

চেঁচামেচিতে বেয়ারা দৌড়ে এল। সুজয় মুখ রক্ষা করার জন্যে স্মার্টলি বলল, দোগো, কোকাকোলা লাও।

আমি আর কোনও কথা বললাম না।

নয়নার নিজের হাতে অনেক অপমান সয়েছি। আজ সুজয়ের কাছেও অপমানিত হয়ে আমার অপমানের ঝুলি পূর্ণ হল। সুজয় আমার কাছে যে কথা চেয়েছিল, তা তাকে দিলাম।

সুজয় আমাকে আরও অনেক কথা বলল। বলল যে, নীতীশ খুব ভাল ছেলে— নিছক আমার ভালবাসাটা স্মেল করেই ও অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য হল। আরও

আরও আরও অনেক কথা বলল। তা আমার কানে গেল না। আমি তখন বসে বসে অনেক কিছু ভাবছিলাম। অনেক পুরনো কথা। ভাবছিলাম, ও নয়নার কথাটা একবারও ভাবছে না। নয়না কি সুজয়ের রিস্টওয়াচ যে, ও যাকে খুশি তার হাতে তাকে পরিয়ে দেবে? নয়নার কি নিজের মন বলে কোনও জিনিস নেই? নীতীশ যদি নয়নাকে রিফিউজ করে থাকে, তাতে নয়নার হার হয়নি কোনও। তা ছাড়া আমার এতে কী করার ছিল? উত্তীয় যেমন করে শ্যামাকে ভালবাসত আমি তো নয়নাকে তেমনি করেই ভালবেসেছি। নিজের মৃত্যু ছাড়া আমার তো অন্য কিছু পাওয়ার ছিল না। নীতীশ ওকে বিয়ে করলেও ছিল না। এখনও নেই। কোনওদিনও থাকবে না। আমার সঙ্গে সুজয় এমন করে নোংরা ভাষায় কথা বলছে কেন?

তা ছাড়া নয়না আমার সঙ্গে এ কী করল? আমার চিঠিগুলি কি এতই মূল্যহীন? ওর চোখে আমার সবকিছুই কি এতখানি সস্তা হয়ে গেছে? আমার এক্ষুনি গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, কী এমন আমি অন্যায় করেছি, ওর কাছে, নীতীশের কাছে, মাসিমার কাছে যে, সুজয় আমাকে ওদের পরিবারের শনি বলে ভাবতে পারে? ওদের সকলের জন্যে, নয়নার জন্যে, এই ক'বছর যত কল্যাণকামনা, যত মঙ্গলকামনা করেছি, তার একভাগও নিজের জন্যে করলে আমি আজ এমন ভাবে সুজয়ের মতো ছেলের হাতে অপমানিত হতাম না।

বুঝতে পারিনি, নয়নাকে আমি চিনতে পারিনি, হয়তো কোনওদিনও চিনতে পারব না। আমি ওকে কুটিল, নীচ, নোংরা, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বলে কোনওদিন চিনতে চাই না। তার চেয়ে আমার চোখে ও অপরিচিতই থাকুক। আমার চোখের অপরিচয়ের সায়ান্ধকারে ও যে মহিমাময়ী মূর্তিতে বিরাজ করছে সেই মূর্তিতেই বিরাজ করুক। আমার সব দুঃখ আমি সইতে পারব, কিন্তু মনে মনে যে নয়নাকে চিনি সে নয়নাকে আমি কোনওদিন অন্য নয়না বলে ভাবতে পারব না।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছিল, কিছু হয়েছিল; যে কারণে ও আমার চিঠিগুলির এমন অসম্মান করেছে। কোনওদিন জানতে পারব না, কী ঘটেছিল।

কানের কাছে সুজয়ের গলাটা কেবল ঝমঝম করছিল—

ঋজু, তুই একটা ইডিয়ট; একটা ফার্স্টক্লাস ইডিয়ট।

সুজয় অনেক কথা বলছিল, হাত নাড়ছিল; আমার কানে কিছুই যাচ্ছিল না।

সুজয় একসময় উঠল। ক্লাবের ভাউচার সই করল। আমার কাঁধে হাত রাখল। বলল, চলি রে।

বললাম, আয়। ক্লাব থেকে সোজা বাড়ি এলাম। এসে খেলার জামাকাপড় না-ছেড়েই ড্রয়ার ঘেঁটে ঘেঁটে নয়নার সেই চিঠিটি বের করলাম। সেই দিনে সে চিঠিটির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

অনেকদিন আগে লেখা চিঠি। একটি ইনল্যান্ড লেটার।

ঋজুদা,

এবারে আর Romanticism চলে না। বাড়িতে ফিরে এসেই ব্যাগ খুলে দেখলাম যে, আর একটি চিঠি রয়েছে।

প্রথমে বলতে ইচ্ছা করল—"আহা কী পাইলাম...ইত্যাদি...।" কিন্তু যখন দেখলাম যে, সেই পুরনো চিঠিটা নেই, আপনি চুরি করেছেন, তখন খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আপনার ওই চিঠিটা আমার এত ভাল লাগত যে আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম। লাইব্রেরিতে বসে সময় পেলে পড়তাম। বারবার পড়তাম। আমার আশা যে, আপনি চিঠিটা আমাকে ফেরত দিয়ে দেবেন।

আজকের চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে, আপনি আমাকে আর চিঠি দেবেন না—আর, কেন দেবেন না তাও লিখেছেন। কিন্তু আপনি ওই সামান্য ব্যাপারের জন্য যদি আমাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করেন তবে সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে।

কিন্তু আজকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনার চিঠি আমি আর কাউকে দেখাব না।

এর পরেও আমি আর আপনাকে চিঠি দেবার জন্য অনুরোধ জানাব না, শুধু এইটুকুই বলি যে, আপনার চিঠি পেতে আমার খুব ভাল লাগে— যার জন্যেই হয়তো ইডিয়টের মতো সকলকে তা দেখিয়ে বেড়াই।

সবশেষে বলি, আপনার ধারণা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনওদিন আমিই নাকি আপনাকে ইডিয়ট বলে প্রতিপন্ন করব, আর এ কথা আপনাকে নাকি আমার দাদাই বলেছে। দাদাই বলুক আর যেই বলুক— আপনি যদি এ কথা মেনে নেন— তবে বলব যে, আপনি এখনও আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি।

শেষ করি।

নয়না।

১৬

আজ দোল-পূর্ণিমা।

সারা সকাল বাইরে যাইনি। দুপুরেও না। বিকেল থেকে বাগানের বেতের চেয়ারে বসে আছি। একটি সর্বপ্রকাশী হলুদ চাঁদ আকাশ ছেয়ে উঠেছে। রঙ্গনের ডালে একজোড়া বুলবুলি পাখি ডেকে ডেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে বাতাসে এক আদিগন্ত ভাল-লাগা। অথচ আমার কোনও ভাগ নেই এতে।

সকালে বাড়িতে অনেকে আবির খেলতে এসেছিলেন। চতুর্দিকে, দেওয়ালে, মেঝেতে, বাগানে আবিরের দাগ। লনেও আবির পড়ে রয়েছে। তার উপরে খালি

পায়ে, মিনুর পাঁচ বছরের মেয়ে মিঠুয়া ঘুরে ঘুরে কাঁপা-কাঁপা গলায় গাইছে—

"ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ পাতায় পাতায় ডালে ডালে...ও আমার..."

চুপ করে বসে বসে ওকে দেখছি। আমার অনেক কিছু ইচ্ছে ছিল, এ জন্মে তার কিছুই পূরণ হল না। মিঠুয়াকে আমি নয়নার মতো অনন্যা করে বড় করে তুলব। নয়নার মতো সেও কম কথা বলবে, চোখ দিয়ে হাসবে, অমনি সংযতা হবে, নয়নার মতন করে ব্যথা পেতে জানবে এবং ব্যথা দিতে জানবে না। মিনুর কাছ থেকে মিঠুয়াকে আমি চেয়ে নেব। তারপর একটি একটি করে আমার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে ওর মধ্যে আমি পুঁটিলেখা ফুলের পাপড়ির মতো ফুটিয়ে তুলব। তারপর, মিঠুয়া যখন বড় হবে, তখন একদিন প্রৌঢ়া নয়নার কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে বলব, এই দ্যাখো, তোমার পুরনো-তুমিকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। তখন নয়না হয়তো লজ্জিত হবে, বিব্রত হবে, ওর হ্যান্ডসাম এক্সিকিউটিভ স্বামীর সামনে অপ্রতিভ হবে, বলবে: কী ছেলেমানুষি করছেন ঋজুদা?

দিনের আলোর গভীরে রাতের কোনও তারাই থাকে না। ও সব মিথ্যে কথা; বানানো কথা। আমার নয়না আমাকে একেবারে ভুলে যাবে। যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মতো।

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। যতীন এসে বলল, দাদাবাবু, তোমার ফোন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরে গেলাম।

ইয়েস। ঋজু কথা বলছি।

ঋজুদা? আমি নয়না।

কোনওদিন নয়না আমাকে নিজে ফোন করেনি। মানে, নিজে থেকে। দায়টা বরাবর আমারই ছিল। তাই আশ্চর্য হলাম।

বললাম, কী ব্যাপার?

কী ব্যাপার? এতদিন তো দেখাই নেই, আজও এলেন না। ভেবেছিলাম সকালে আসবেন। বেলা একটা অবধি আপনার জন্যে চান না করে বসে ছিলাম।

সত্যি কিছু মনে কোরো না। কোথাওই যাইনি। তারপর একটু থেমে বললাম, তোমরা বুঝি খুব মজা করলে?

কীসের মজা?

তোমার বন্ধু-বান্ধবীরা আসেনি এবার?

এসেছিল। ওরা সবাই এসেছিল। খুব হইহই হয়েছিল। কিন্তু মজা হয়নি।

কেন?

জানি না।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরময়। সমস্ত কলকাতা শহরটা দোল-পূর্ণিমার হাসনুহানা রাতে একটি হাসিনী হলুদ বেলুনের মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমার ঘর এমনিতে আজ অন্ধকার। বাল্‌বটা কেটে গেছে। আকাশের হলুদ

ঝাড়লণ্ঠন নিভে গেলে হয়তো অন্ধকারেই থাকবে। হয়তো আলো জ্বলবে না আর।

নয়না বলল, কী হল? কথা বলুন?

কী কথা বলব? সব কথাই তো আমার বলে ফেলেছি। তাই চুপ করেই রইলাম।

কী হল?

বললাম, পড়াশুনা করছ তো? ফার্স্টক্লাস পেতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন।

পেয়ে কী হবে?

কী হবে তা জানি না। অন্তত নিজে সার্থক হবে।

কেবলমাত্র নিজের জন্যেই যারা সার্থক হতে চায় তারা কিন্তু স্বার্থপর।

তুমিও?

জানি না। হয়তো আমিও। ভাল করে ভেবে দেখোনি কখনও।

তুমি ফার্স্টক্লাস পেলে আমার কিন্তু খুব গর্ব হবে।

জানি আমি। যদি পাই তো সেটা হয়তো পাওয়ার একটা কারণ হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

জাস্টিস মুখার্জির বাড়ির গাড়োয়ালি দারোয়ান বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির বেদনার সুর কেঁপে কেঁপে হাওয়ায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। যেন নীল আকাশে সাঁতার কেটে উপরে পৌঁছে চাঁদের হলুদ লণ্ঠনকে ব্যথায় নীল করে দেবে।

কতদিন পরে নয়নার সঙ্গে কথা বলছি। কী যে ভাল লাগছে!

আপনি যেন কেমন হয়ে গেছেন ঋজুদা!

কেন?

আগের মতো করে কথা বলছেন না তো আমার সঙ্গে!

আসলে আমি ভুলে গেছি, আগে তোমার সঙ্গে কী করে কথা বলতাম। তুমি কী শাড়ি পরে আছ আজ?

বলব না।

কেন?

খুশি।

বোকামি কোরো না নয়না। কোনওদিন কি আমি বড় হব না?

না। আপনাকে আমি কোনওদিন বড় হতে দেব না।

আমি চুপ করে রইলাম।

কই? তবু কথা বলছেন না যে?

আমাদের এখানে দারুণ চাঁদ। আমার ঘরে আজ আলো জ্বলেনি। চাঁদের আলোয় ঘর হলুদ হয়ে আছে।

তা হলে আপনার হলুদ-বসন্ত পাখিকে সে ঘরে ডাকছেন না কেন? এই নামের জন্যে কিন্তু আমার ভারী গর্ব, ঋজুদা। অন্য কাউকে আপনি এ নামে ডাকতে পারবেন না। এ আমার একান্ত নাম।

কোনও জবাব দিলাম না।

কী? কিছু বলবেন? না ফোন ছেড়ে দেব?

এই তো ভাল। তোমার কথা শুনতে ভাল লাগছে। তুমিই বলো।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়াতে ও বলল, মনে পড়ে গেল পাখির কথায়; বলুন তো এই লাইন দুটি কার? বলেই সুর করে টেনে টেনে আবৃত্তি করল—

"সুখ নেইকো মনে,
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে
হলুদ বনে বনে..."

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, কী? জানেন না তো?

বললাম, পঙ্‌ক্তি ক'টি দারুণ। তবে কার লেখা জানি না।

অনেকক্ষণ ও চুপ করে রইল, তারপর বলল, আপনি কিছুই জানেন না। আপনি নিজেকে জানেন?

বললাম, আমি নাই বা জানলাম। তুমি তো জানো।

ও বলল, জানি। মুখে বলি না বলে কি ভাবেন জানি না? আমি সব জানি। এমন অনেক কথা আছে যা না বললেই অনেক স্পষ্ট করে বলা হয়। আপনি হয়তো বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি করি। আসলে আজকাল আপনি আমাকে দেখতে পারেন না। একটুও ভালবাসেন না, কিচ্ছু না; খারাপ।

আমার জবাবের আগেই শুনতে পেলাম ও রিসিভারে মুখ রেখেই উঁচু গলায় বলল—যাচ্ছি মা।

তারপরই বলল, ঋজুদা, কারা যেন এসেছেন, মা একা আছেন, আমায় ডাকছেন। আজকে রাখি, হ্যাঁ?

রিসিভার রাখতে রাখতে তাড়াতাড়ি বলল, বলুন কবে আসবেন? এবার থেকে রোজ আসতে হবে।

বললাম, আসব, দেখো ঠিক আসব।

সত্যি?

সত্যি।

নয়না একদিন বুঝতে পারবে যে, আমি আমার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আর কোনওদিন ওর কাছে গিয়ে নির্লজ্জের মতো কাঙালপনা করব না। এতদিন তো ভিখিরির মতোই ভালবেসেছি— কিন্তু সেদিন আমায় যে রাজমুকুট ও নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল সে মুকুট খুলে ফেলার মতো এত বড় হীন আমি কী করে হব? রাজার অভিনয় করে আমি আমার অনন্যা নয়নার সমকক্ষ হব। ও একদিন সবই জানবে। সবই জানতে পাবে। কিন্তু ও কোনওদিন জানবে না যে, আমার এই বুকভরা আর্তি থাকবেই। ওর সঙ্গে দেখা হলেই ভিতরের ভিখিরিটা রাজার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষা চাইবেই।

এই ভাল। দেখা না হওয়াই ভাল। কথা না হওয়াই ভাল। তার চেয়ে আমার দুরন্ত লোভগুলি আমার বুকের ভিতরেই ঘুমিয়ে থাকুক অথবা বুকের ভিতরেই ঘুম-ভেঙে উঠে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ক্যান্সারের মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলুক; তবু নয়না আমার সুখে থাকুক, খুশি থাকুক। আমার অশেষ আর্তি তার সুখকে কোনওদিন যেন বিঘ্নিত না করে।
